মূলঃ মুফতী শফি (রহঃ)

অনুবাদ ঃ মুহাঃ আবু ইউসুফ

জিহাদ

(ফাযায়েল, মাসায়েল ও দুআ)

মুফতী শফী (রহঃ)

সম্পাদনা

মুফতী ওলীউল্লাহ

অনুবাদ

মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ

জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া ঢাকা-এর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ মাদ্‌রাসার মজলিসে শূরার সদস্য, আন্তর্জাতিক তাহাফ্‌ফুযে খতমে নবুয়তের সহ সভাপতি **হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান** সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দুআ

বর্তমান মুসলিম উম্মাহ্ যে করুণ অবস্থা অতিক্রম করছে তা কারো অজানা নয়। সচেতন ব্যক্তি মাত্রই ইসলাম ও মুসলমানের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কেননা আজ তারা চতুরমুখী আক্রমনের শিকার। একদিকে কুফুরী শক্তিগুলো ইসলামের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে একে প্রগতির অন্তরায় হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে পরিচিত করার সমূহ চেষ্টায় লিপ্ত। অন্যদিকে বাতিল ও তাগুতি শক্তির ধ্বজাধারীরা মুসলমানদেরকে শতধা বিভক্ত করে দুর্বল করতে বদ্ধপরিকর। মুসলমান যেন সচেতন হতে না পারে বা হলেও যেন কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ না পায়; এজন্য অমুসলিম ও কাফেররা আজ ঐক্যবদ্ধ। মুসলমানদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ এবং তাদের সম্মান ও সকল অধিকার রক্ষার ফরয বিধান জিহাদকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চায়।

বক্ষমান গ্রন্থে আল্লামা মুফতী শফী (রহঃ) তাগুতী শক্তির অক্টোপাস থেকে মুক্তিলাভ করে মুসলমানদের হৃত সম্মান ও অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রধান মাধ্যম জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যা মুসলিম উম্মাহর চেতনাকে শাণিত করবে।

স্নেহধন্য আমাদের ছাত্র মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ উক্ত গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। আমি উক্ত পাণ্ডুলিপিটি দেখেছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে নতুন হলেও তার অনুবাদের ভাষা সাবলীল ও প্রাঞ্জল।

আমি দুআ করি আল্লাহ পাক তাকে এই পথে আরো অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। সাথে সাথে তার এই খেদমতটুকু কবুল করে এ পুস্তিকাকে পাঠকদের প্রকৃত জিহাদী চেতনা ফিরিয়ে আনার মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

ফজলুর রহমান

(মাওলানা ফজলুর রহমান)
মুহাদ্দিস ও ভাইস প্রিন্সিপ্যাল
জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া
২৯/৯/২০০২ইং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি জিহাদকে মুসলমানদের উপর ফরয করেছেন। দরূদ ও সালাম নবীউস সাইফ নবীউল মালহাম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি ২৭টি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তায়েফের মাটি রক্তে রঞ্জিত করেছেন; উহুদে দান্দান মোবারক শহীদ করেছেন; খন্দকে চার ওয়াক্ত নামায কাযা করেছেন। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সেই সকল সহচরবৃন্দের প্রতি যাঁরা জিহাদের হুকুম বর্ণিত হওয়ার পর থেকে জিহাদের পথে আত্মনিয়োগ করে সর্বশেষ রক্তবিন্দুটুকুও আল্লাহ তাআলার রাহে অকুণ্ঠচিত্তে বিলীন করে দিয়েছেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে যেমন রয়েছে রূহানী দিক-নির্দেশনা সম্বলিত বিধি-বিধানের সমাবেশ; তেমনি আছে মানুষের দুনিয়াবী ও পার্থিব জীবনের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা। একটি দেশের মানুষের শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে কেবলমাত্র একটি কল্যাণময় রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিয়েছে ইসলাম। আর এই কল্যাণময় রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করার জন্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে বহু প্রচেষ্টা। গণতন্ত্রসহ বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের বহু প্রচেষ্টা। এসব কোন তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র চালু করা আদৌ সম্ভব নয়। যার জ্বলন্ত প্রমাণ আলজেরিয়া।

পক্ষান্তরে 'জিহাদ' এমন একটি খোদা প্রদত্ত ফরীযা ও ফরয আমল যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা কুরআনে কারীমের ভাষায়

ফরযে আইন ঘোষণা করা হয়েছে। এই জিহাদের নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আফগানিস্তানের বিগত পাঁচ বছরের রাষ্ট্র পরিচালনা। অতএব, একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য জিহাদের বিকল্প নেই।

ছোটকাল থেকেই জিহাদের প্রতি মনের আগ্রহ। জিহাদ সম্পর্কীয় বই সামনে আসলে পড়ে ফেলাই হৃদয়ের টান। ২০০০ সনের প্রথম দিকে কোন এক কুতুবখানা সাফাই করতে গিয়ে হঠাৎ পাকিস্তানের প্রধান মুফতী শফী (রহঃ)-এর লেখা 'جہاد' নামক একটি উর্দূ পুস্তিকা আমার চোখে পড়ে; যাতে রয়েছে জিহাদের ফাযায়েল, মাসায়েল ও গুরুত্বপূর্ণ দুআ। উক্ত কুতুবখানার যিম্মাদার শিক্ষক থেকে অনুমতি নিয়ে পুস্তিকাটি পড়ি এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করে অনুবাদ করার ইচ্ছা মনে মনে লালন করতে থাকি। কিন্তু সময়ের অভাবে ও ইলমী অযোগ্যতার দরূন এ মহান কাজে হাত দেওয়ার সাহস হচ্ছিল না। রমযান মাসে মাদ্‌রাসা বন্ধের সুযোগে কাঁচা হাতে এর অনুবাদ কার্য শেষ করি। অতঃপর আমার পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব হাফেয মাওলানা মুফতী ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের সামনে পেশ করি। তিনি আমাকে ছোট কাল থেকেই অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং পড়ালেখা সহ সর্ব বিষয়ের খবরাখবর নিতেন। তিনি উক্ত পাণ্ডুলিপি দেখে যারপর নাই খুশি হন। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এটি দেখেন এবং অনেক কাটছাট করে ঠিক করে দেন। এরপরও বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে দেড়বছর পর্যন্ত উক্ত পাণ্ডুলিপিটি ফাইল বন্ধই থেকে যায়। বিভিন্ন পরামর্শের ক্ষেত্রে যার ভূমিকা অগ্রগণ্য তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় বড়ভাই জনাব মাওলানা সালাহুদ্দীন। শোকর আদায় করে তাঁকে খাট করতে চাই না। প্রকাশনার ক্ষেত্রে স্নেহের ছোটভাই ইমরানের অবদান আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। তাকে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দিন। এছাড়া আরো যাদের থেকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা পেয়েছি আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন।

পাঠক ভাইদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, অনুবাদের ক্ষেত্রে যেহেতু এটিই আমার প্রথম পদচারণা, তাই ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। অতএব কোন অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হলে সমালোচনার হাত প্রসারিত না করে সহীহ নিয়তে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সুধরে নেওয়ার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। আর এ বইটি পড়ে যদি একটি তাজা প্রাণও আল্লাহ তাআলার রাস্তায় উৎসর্গ হয়, তাহলেই আমাদের শ্রম সফল ও সার্থক হবে।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে আমার আকুতি, তিনি যেন এর দ্বারা লেখক, সম্পাদক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের সর্বশেষ রক্তবিন্দুটুকু আল্লাহ তাআলার রাস্তায় নযরানা হিসেবে পেশ করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার তাওফীক এনায়েত করেন। আমীন।

–বিনীত

ঢাকা-১২০৭

আবু ইউসুফ

তাং ০৮/০৯/০২ঈসায়ী

উৎসর্গ

শুহাদায়ে বদর থেকে নিয়ে অদ্যাবধি যাঁদের কলজে ছেঁচা তপ্ত লহুর বিনিময়ে ইসলাম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে; বিশেষ করে মজলুম মানবতার আর্তচিৎকারে এগিয়ে যাওয়া আরাকান রণাঙ্গনে প্রাণোৎসর্গকারী শহীদ কাওসার (রহঃ), শহীদ মীর আহমদ (রহঃ) ও শহীদ আমীন (রহঃ)সহ আরাকান জিহাদে শাহাদত বরণকারী সকল শহীদের আত্মায় এ বইয়ের সমস্ত সওয়াব উৎসর্গিত হল।

—অনুবাদক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

জিহাদ ইসলামের ফরয আমলসমূহ যথা নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মর্মে ইরশাদ করেন ঃ

اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।"

কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের অসংখ্য বর্ণনা এবং উম্মতের ঐকমত্য দ্বারা জিহাদের ফরযিয়ত তথা ফরয হওয়ার বিষয়টি সুপ্রমাণিত; কিন্তু হিন্দুস্তান ইংরেজদের দখলমুক্ত হওয়ার পর এখানে প্রকাশ্যভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদ ও কিতালের সুযোগ থাকেনি; ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত ও মাসআলাসমূহ বিলুপ্ত হতে থাকে। সাধারণ দ্বীনদার মুসলমান তো নামায-রোযার মাসায়েল সম্পর্কে যতসামান্য হলেও অবগত আছে; কিন্তু জিহাদ কখন ফরয হয়? এর হুকুম-আহ্কাম কি? এর আদব কি?—এসব ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ।

পৃথিবীর বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল জিহাদের ফরযিয়তের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করা। পাকিস্তানের মুসলিম যুবকদেরকে ফৌজি

প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা। তাদের অন্তরে জিহাদের স্পৃহা সৃষ্টি করা; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা পাকিস্তান লাভের পরও পূর্বের ন্যায় নিজেদের সেই গুরু দায়িত্ব বেমালুম ভুলে আছি।

কুরআন হাদীসের অসংখ্য ভাষ্য, এমনকি ইসলামের পুরো ইতিহাস সাক্ষী যে, যখনই মুসলমান জিহাদ ছেড়ে দেয় তখনই অন্য সম্প্রদায় তাদের উপর চড়াও হয় এবং মুসলমানদের অন্তর ওদের দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। মুসলমানদের পরস্পরে অনৈক্য দেখা দেয়। তাই তো আজ মুসলমানদের বীরত্ব ও শক্তি কাফেরদের পরিবর্তে কেবল নিজেদের মাঝে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এটিই মুসলমানদের ধ্বংসের মূল কারণ।

এখন আমরা নিজেদের সেই গাফলত ও উদাসীনতার শাস্তি ভোগ করছি। চতুরদিক থেকে শত্রুদের আক্রমন আসছে। আর মুসলমানরা বিভিন্ন পার্টি, ফেরকা, দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগেছে।

১৯৬৫ইং সনে পাকিস্তানের উপর ভারতের আকস্মিক হামলার সময় অধম (গ্রন্থকার–মুফতী শফী রহঃ) 'জিহাদ' নামক একটি পুস্তিকা লিখেছিলাম। যার মধ্যে জিহাদের সংজ্ঞা, ফযীলত ও হুকুমের বিষয়াদি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি, হ্যাণ্ডবিল ও পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয় এবং সাধারণ জনগণও দুআর প্রতি ধাবিত হয়।

আল-হাম্‌দুলিল্লাহ, সে সময় আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে অতি দ্রুত সকল মুসলমানের মাঝে জিহাদী স্পৃহা সৃষ্টি করে দেন। মানুষ আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হতে থাকে। আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদ প্রত্যক্ষ করতে লাগল। ফলে জুলুম-অত্যাচার মুহূর্তের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যায়। এর কৃতজ্ঞতা তো এটাই হওয়া উচিত ছিল যে, যুদ্ধ শেষে আমরা আরো অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হব এবং ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদের প্রস্তুতিতে

লেগে যাব; কিন্তু আফসোস! কাজটা হল সম্পূর্ণ উল্টো। এখন পুনরায় সেই পুরাতন শত্রু আমাদের সীমান্তে আক্রমন শুরু করেছে। কাজেই এখন এই পুস্তিকাটি আরো বর্দ্ধিত ও পরিমার্জিতরূপে প্রকাশ করা হল। এখন প্রয়োজন শুধু এটাকে সকল সৈন্য ও জনসাধারণের নিকট বহুল প্রচার করা।

রাহ্মানুর রাহীমের দরবারে আরয, তিনি যেন আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন, আমাদের অন্তরে পুনরায় জিহাদের স্পৃহা জাগ্রত করেন এবং আমাদেরকে জিহাদের সঠিক হক আদায় করার তাওফীক দান করেন। আমীন॥

বান্দা মুহাম্মাদ শফী

৬ শাওয়াল, ১৩৯১ হিজরী

সম্পাদকীয়

আধুনিক বিশ্বে যে সব বিষয় প্রচুর আলোচনা, সমালোচনা, পর্যালোচনা, অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচারের শিকার জিহাদ তথা কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ ও মুজাহিদীনে কেরামের আদর্শ ও মতবাদ সেগুলোর অন্যতম। ইসলামের এ মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আজ সর্বোপরি ঘৃণ্য চক্রান্তের রেড়াজালে আবদ্ধ। আজকের সমাজে জিহাদ ও মুজাহিদীনের তৎপরতা রীতিমত মহা অপরাধ।

এ দুঃখজনক পরিস্থিতির প্রধান কারণ কয়েকটি। যথা ঃ ১. জিহাদ সম্পর্কে অজ্ঞতা, ২. মুসলমানদের এ বিষয়ে চরম উদাসীনতা, ৩. একশ্রেণীর মুসলমানের (?) জিহাদের প্রতি সীমাহীন অনীহা, ৪. কাফের-মুশরেকদের অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও বিশ্ব মানচিত্রে জিহাদী কার্যক্রম ও মুজাহিদীনে কেরাম সমহীমায় প্রতিষ্ঠিত এবং তা কিয়ামত অব্যাহ থাকবে এ কাফেলার তৎপরতা।

বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতি ও দিকে দিকে তুমুল জিহাদী উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জিহাদের সঠিক চিত্র ও বিধানাবলী সম্বলিত বই-পুস্তকের নিদারুণ আকাল। গ্রীষ্মের শেষে পৃথিবীর মৃত্রিকার জন্য যেমন এক বিন্দু পানির খুবই প্রয়োজন তেমনি একটি জিহাদী বইয়ের আরো অধিক প্রয়োজন। যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মিটানোর মানসে এ বিষয়ে কলম ধরেছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিদগ্ধ আলেম, বিশিষ্ট ইসলামী আইনবিদ ও বুযুর্গ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)। হযরতে আকদাস (রহঃ) স্বল্প পরিসরে যে প্রাঞ্জল ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন তা প্রসংশার অপেক্ষা রাখে না। বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ ও উদীয়মান কলমযোদ্ধা আবু ইউসুফ। এটি তার প্রথম সাহিত্যকর্ম। এরপরও তা সবার কাছে প্রসংশা পাওয়ার যোগ্য হবে বলে আশাকরি। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বদলা

দিন ও কলমী ময়দানে একজন বলিষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে কবূল করুন। আমীন।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। বইয়ের সকল সৌন্দর্য বিশ্ব প্রভুর। ভুল-ত্রুটি এ অধম সম্পাদকের। যে কোন বিচ্যুতি অবগত করলে পরবর্তীতে সংশোধন করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি রইল।

বিনয়াবনত
মুহাম্মাদ ওলীউল্লাহ
তাং ০২/১০/০২ ঈসায়ী

ঢাকা-১২০৭

জিহাদ

জিহাদের অর্থ

জিহাদের আভিধানিক অর্থ হল কোন কার্য সিদ্ধির জন্য স্বীয় শক্তি এবং পূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করা।

শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়, আল্লাহ তাআলার কালেমাকে বুলন্দ করার মানসে এবং শত্রু প্রতিরোধে জান, মাল, যবান ও কলমের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহঃ) জিহাদ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, জিহাদ তিন প্রকার। যথা ঃ

১. প্রকাশ্যভাবে (ময়দানে) শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা।

২. শয়তান এবং ওর দোসরদের সৃষ্টিকৃত ধারণার মোকাবেলা করা।

৩. নিজের অন্তরের কুপ্রবৃত্তির মোকাবেলা করা।

অর্থাৎ, যে কোন বস্তুই আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয় তা প্রতিরোধ করাই জিহাদ। আর এই প্রতিবন্ধকতা সাধারণত এ তিন দিক থেকেই হতে পারে। তাই জিহাদ তিন প্রকার বলা হয়েছে।

ইমাম রাগেব (রহঃ) এই তিন প্রকার বর্ণনা করার পর বলেন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. (আল্লাহর রাস্তায় পূর্ণাঙ্গভাবে জিহাদ কর।) এ আয়াতে উপরোক্ত তিনও প্রকার জিহাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোন কোন হাদীসে নফস ও প্রবৃত্তির নাজায়েয কামনা-বাসনার মোকাবেলা করাকে জিহাদ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কুরআন কারীমের কোন কোন আয়াতে জিহাদের জন্য মাল খরচ করাকেও জিহাদ বলা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ.

"তোমরা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের হাতিয়ারের ব্যবস্থা করল সেও জিহাদ করল।

অন্য এক হাদীসে জিহ্বা ও যবানের প্রচেষ্টাকেও জিহাদ বলা হয়েছে। আর কলম যেহেতু বিষয়বস্তু আদায়ের ক্ষেত্রে যবানের স্থলাভিষিক্ত। তাই উলামায়ে কেরাম কলমের প্রতিরোধকেও জিহাদের মধ্যে শামিল করেছেন।

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ থেকে বুঝা যায় যে,শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যে কোন প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা বা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় যখন জিহাদ শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন কেবলমাত্র শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইকে বুঝানো হয়। আর এর জন্য পবিত্র কুরআনে 'কিতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

জিহাদের নিয়ত

সকল মুসলমানই জানে যে, যে কোন আমল ইবাদত হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া। তাই নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি আদায় করার ক্ষেত্রে নিয়তকে সহীহ ও শুদ্ধ করে নেওয়া ফরয ও জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট বাণী রয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى.

"সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর বান্দা আমলের প্রতিদান তেমনই পাবে যেরূপ সে নিয়ত করেছে।" –সহীহ বুখারী

অর্থাৎ ইবাদত করলে সওয়াব তখনই হবে যখন সে আমল একমাত্র আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য

এবং সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে; পার্থিব আসবাব-সামগ্রী, সম্মান-মর্যাদা ও পদলোভের উদ্দেশ্যে না হবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তাআলার নিকট সেটা ইবাদত তো হবেই না; বরং তা রিয়া বা লৌকিকতা হবে যা সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হিসেবে পরিগণিত হবে। উলামায়ে কেরাম এই হাদীসকে ইসলামের একচতুর্থাংশ বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, ইসলামী শিক্ষার বড় একটা অংশ এর উপর নির্ভরশীল।

যে আলেম প্রসিদ্ধিলাভ, নাম ও যশের জন্য ইল্মী খেদমত আঞ্জাম দেয়; যে মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে সুখ্যাতি ও উপহার-উপঢৌকনের আশায় জীবন উৎসর্গ করে শহীদ হয়; যে ব্যক্তি নাম ও যশের উদ্দেশ্যে দ্বীনী খেদমতের মধ্যে বড় উদারতার সাথে মাল-দৌলত ব্যয় করে–এ তিনো ব্যক্তি সম্পর্কে সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন, তাদেরকে একথা বলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যে, তোমরা যে উদ্দেশ্যে ইল্মে দ্বীনকে ব্যবহার করেছ; যে উদ্দেশ্যে তোমরা জীবন উৎসর্গ করেছ; যে উদ্দেশ্যে মাল খরচ করেছ–আমি তোমাদের উক্ত উদ্দেশ্য দুনিয়াতেই পূর্ণ করে দিয়েছি। মানুষের মাঝে তুমি বিজ্ঞ আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছ; তোমাকে গাজী ও শহীদ বলা হয়েছে; মাল ব্যয় করার কারণে তোমাকে দানশীল এবং উদার বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং এখন আর তোমরা আমার নিকট কি চাও? (নাউযুবিল্লাহ)

জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণকারী আমার ভ্রাতৃবৃন্দ যাঁরা দুনিয়ার মায়া ছেড়ে নিজেদের জীবনোৎসর্গ করে যাচ্ছেন, তারা এমন মহান দায়িত্ব আ ঞ্জামদিয়ে যাচ্ছেন, যার সওয়াবের কোন তুলনা হতে পারে না। এ সকল সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য একান্ত কর্তব্য হল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত সতর্কবাণী সর্বদা স্মরণ রাখা। জিহাদের ময়দানে ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে শুধু এই নিয়ত করবে যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাযত এবং ইসলামের

শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্য জিহাদ করছি। পার্থিবস্বার্থ, ফলাফল ও বিনিময় আল্লাহ তাআলাই দান করবেন; তবে জিহাদের সময় এ সবকে স্বীয় অন্তরে স্থান দেওয়া যাবে না। (আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন।)

মুমিনের জিহাদ জন্মভূমির জন্য নয়; বরং ইসলামের জন্য

ইসলাম শুরুলগ্নেই জাতি, বর্ণ, রঙ ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে একাত্বতার প্রতিমাকে ভেঙ্গে দিয়ে একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে একাত্বতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্তের বাসীন্দা আরবী, হিন্দী সকলকেই ইসলামের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

এতে এমনই এক ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা পৃথিবীর সকল দলমত এবং ঐক্যকে উলট-পালট করে দেয়।

বিগত কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে ইউরোপীয়রা ইসলামের একচ্ছত্র সীমাহীন শক্তির সাথে অপারগ হয়ে বড় চতুরতা এবং তীক্ষ্মতার সাথে জনগণের মধ্যে পুনরায় জাতি, বর্ণ, রঙ ও ভৌগোলিক স্থানস্পৃহা সৃষ্টি করে দিয়েছে; যেন ইসলামী ঐক্যকে জাতি, ভাষা ও ভৌগলিক বিচ্ছেদের মাধ্যমে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া যায়। কাফেরদের কাছে তো এমন কোন ধর্ম বা মাযহাব ও আদর্শ নেই যার নাম ধরে সারা পৃথিবীর মানুষকে একত্রিত করতে পারে; এজন্য তারা কখনো গোত্র ও বংশ হেফাযতের নাম নিয়ে যুদ্ধ করে; আবার কখনো স্বীয় জন্মভূমি এবং রাষ্ট্রের নাম নিয়ে জনগণকে একত্রিত হওয়ার দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে একত্রিত করে এবং যুদ্ধ করে।

মুসলমান জাতিকে আল্লাহ তাআলা ঐ সকল বস্তু থেকে পবিত্র রেখেছেন। তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলা এবং ইসলামের জন্য জিহাদ করে এবং যে জন্মভূমি বা বংশ আল্লাহ তাআলা ও ইসলামের পথে

বাঁধা–এমন বংশ বা জন্মভূমিকেও উৎসর্গ করার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করে না। ইসলামের সর্বপ্রথম মদীনার হিজরত এবং বদর ও উহুদের ময়দান আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়। কেননা, একই বংশ ও গোত্রের লোক আপন লোকের উপর এজন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে, সে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু ছিল। যদি জন্মভূমি ও গোত্রীয় ঐক্য ও সংহতিই উদ্দেশ্য হত তাহলে এই সকল জিহাদের কোন অর্থই হয় না।

আজকাল সাধারণ লোকদের কণ্ঠে জন্মভূমির শ্লোগান শোনতে শোনতে মুসলমানরাও এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারাও স্বীয় জিহাদকে জন্মভূমির জন্য বলতে শুরু করছে। আল্লাহ তাআলার শোক্‌র যে, তিনি আমাদের অধিকাংশ যুবকদেরকে এসব থেকে পবিত্র রেখেছেন। কারণ তারা স্বীয় জীবন শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই বিসর্জন দেয়; জন্মভূমির জন্য নয়। কিন্তু 'সময়ের দাবী' আমাদের সবার মুখের শব্দ বনে যাওয়ার কারণে অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকগণ সম্ভবতঃ অন্য মনস্কে এই শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকেন। তাদের জন্য এই সকল শির্‌কী শব্দাবলী থেকেও বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক।

ইসলাম আমাদের জন্মভূমি

আমরা দেশ পূঁজক নই। ইসলাম আমাদেরকে সে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেয় যেখানে ইসলামের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়।

এটি এমন এক চেতনা যা পাকিস্তান বানিয়েছে এবং কোটি কোটি মুসলমানকে হিযরত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রাচ্য কবি মরহুম ইকবাল এই বিষয়গুলোকে বড়ই তীক্ষ্মতার সাথে বুঝিয়েছেন। দেশাত্ববোধের উপর তাঁর কয়েকটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

اس دور مے اور هے جام اور هے جم اور

ساقي نے بنا کی روش لطف وکرم اور

مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور

تھذیب کے آواز نے ترشوائے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن هے

جو پیرھن اس کا هے وہ ملت کا کفن هے

بازو ترا توحید کی قوت سے قوی هے

اسلام ترا دیس هے تو مصطفوي هے

نظارئہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے

اے مصطفوی! خاك میں اس بت کو ملا دے.

'এ যুগের মদও ভিন্ন প্রকারের এবং এর পাত্র ও উপাদানও ভিন্ন প্রকৃতির।

শরাব পরিবেশনকারীগণও তাদের আপ্যায়নের মধ্যে এনেছে ভিন্নতা।

আর মুসলমানরাও তাদের জন্য নির্মাণ করেছে নতুন কা'বা গৃহ।

আর সভ্যতার শ্লোগানও নতুন উপাস্য মূর্তি তৈরী করেছে।

আর এই নতুন পূঁজনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদই (রঙ, ভাষা ও গোত্রীয়) সবারশীর্ষে

ধর্মীয় পোশাকই হচ্ছে তার পরিধেয় জামা।

তোমার বাহু তো একত্ববাদের শক্তিতে শক্তিশালী

ইসলামই হচ্ছে তোমার মাতৃভূমি আর তুমি হচ্ছো নবী মুস্তফা (সাঃ)-এর অনুসারী।

সেই বহুল আকাংখিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন লোকদেরকে দেখিয়ে দাও।

হে নবী মুস্তফা (সাঃ)-এর অনুসারী! (সভ্যতা নামের) এই ভূতকে মাটির সাথে মিশিয়ে দাও।

জিহাদের শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য হাতিয়ার

ধৈর্য ও খোদাভীরুতা

আজ বিশ্বের মানুষ তার প্রতিপক্ষের উপর বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের হাতিয়ার এবং চেষ্টা প্রয়োগ করে। আর বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে তো হাতিয়ার আর কৌশলের কোন অভাব নেই। ইসলামও প্রয়োজনীয় জাগতিক সামগ্রী ও যুদ্ধোপকরণ তৈরী ও ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে (ইনশাআল্লাহ)। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, জাগতিক হাতিয়ার এবং কৌশলের ক্ষেত্রে অন্য জাতির উপর মুসলমানদের কোন বিশেষত্ব নেই এবং হতেও পারে না। বরং যেহেতু অমুসলিমরা সাধারণতঃ সকল মেধা, চিন্তা-চেতনা ও সর্বশক্তি জাগতিক হাতিয়ার প্রস্তুত ও ব্যবস্থার পিছনে ব্যয় করে। তাই তারা এ ব্যাপারে মুসলমানদের তুলনায় সর্বদা অগ্রসরই থাকবে। ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয়; তবে মুসলমানদের নিকট এমন অলৌকিক শক্তি রয়েছে যা অপ্রতিরোধ্য। কাফের গোষ্ঠী যার মোকাবেলা করতে অক্ষম। সেটা হল আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদ। এ খোদায়ী মদদ ও সাহায্য অর্জনের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যখনই মুসলমানরা এ সকল শর্ত পূরণ করবে তখনই আল্লাহ তাআলার মদদ ও সাহায্য আসবে। আর সংখ্যালঘু এবং স্বল্প অস্ত্রধারীদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অজস্র অস্ত্রধারীদের উপর বিজয়ী করে দেখিয়ে দেন।

আর যখন স্বয়ং মুসলমানরা সে সব শর্ত পূরণ করতে গাফলতী ও অলসতা প্রদর্শন করে তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতার কোন অঙ্গীকার থাকে না। নিজেদেরকে এসবের যোগ্য মনে না করাই উচিত। এতদসত্ত্বেও যদি আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার সাহায্য আসে তাহলে সেটা তার বিশেষ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা ছাড়া কিছুই নয়। যেমনটি ৬৫ সালে পাকিস্তানের উপর ভারতের আক্রমণের সময় পরিলক্ষিত হয়েছে। তখন আমরা সে সব শর্তের উপর

কোন প্রকার আমলই করতে পারেনি, যদ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য আসতে পারে। কিন্তু তিনি স্বীয় করুণায় এক এক করে আমাদের অবস্থার উপর ইনকিলাব সৃষ্টি করে আমাদেরকে সবর ও তাক্বওয়ার নিকটতম করে দিয়েছেন এবং তাঁর সাহায্যের এমন মুজেযাসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, শত্রুরাও এর সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার মদদ লাভের শর্তাবলী কি, তা কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে ঃ

١- يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ.

১–"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" –সূরা বাকারা ঃ ১৫৩, রুকূ ১৯

٢-وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

২–"রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, এরাই সত্যাশ্রয়ী; আর তারাই পরহেযগার।" –সূরা বাকারা ঃ ১৭৭, রুকূ ২২

٣-وَقَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

৩–"(মুজাহিদরা) বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ, আমাদের সাহায্য কর কাফের জাতির বিরুদ্ধে।" –সূরা বাকারা ঃ রুকূ ৩৩

٤-وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا.

৪–"আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তাদের প্রতারণা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।" –সূরা আলে ইমরান ঃ রুকূ ১৩

٥- بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا

يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

৫–"নিঃসন্দেহে, যদি তোমরা ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন কর আর শত্রু তোমাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে তাহলে তোমাদের প্রভু পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।" –সূরা আলে ইমরান ঃ রুকূ ১৩

٦–وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

৬–"যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং পরহেজগারী অবলম্বন কর তবে তা হবে একান্ত সৎ সাহসের কাজ।" –সূরা আলে ইমরান ঃ রুকূ ৯

٧–يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

৭–"হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং ইবাদতে মনোনিবেশ কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" –সূরা আলে ইমরান

٨–وَقَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

৮–"এবং মূসা তার কওমকে বলল, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং সুপরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।" –সূরা আরাফ ঃ ১৫

٩– وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَاۤئِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ.

৯–"আর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমাদের পালনকর্তার নেক প্রতিশ্রুতি, বনী ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর

ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ তৈরী করেছিল।" –সূরা আরাফ ঃ রুকূ ১৬

১০-اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

১০–"নিশ্চয়ই সে সকল ব্যক্তি যারা ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে আল্লাহ এমন নেককার লোকদের বিনিময় ধ্বংস করবেন না।" –সূরা ইউসুফ

উপরে কুরআন কারীমের দশটি আয়াত উদ্ধৃত হল। এগুলো তেলাওয়াত করা এবং বার বার গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করা উচিত। এতে মানুষের সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; বিশেষ করে জিহাদ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদ, সাহায্য-সহযোগিতা ও বিজয় লাভের উপায় ও ব্যবস্থাপত্র বলে দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যবস্থাপত্রে যে কয়টি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় তা হল– নামায, ধৈর্য ও তাকওয়া।

এই আয়াতসমূহের মধ্যে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আল্লাহ তাআলার এটাই বিধান ছিল যে, এই মদদ ও সাহায্য-সহযোগিতা সে সব লোকদের ভাগ্যেই জুটে যাঁরা ঈমানের সাথে নামায, ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

নামাযের অর্থ এবং এর গুরুত্ব কমবেশী সকল মুসলমানই জানে। সুতরাং এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

'صبر' (সবর) আরবী শব্দ। আমাদের পারিভাষিক অর্থের তুলনায় আরবী ভাষায় এর অর্থের ব্যাপকতা অধিক।

আরবী ভাষায় 'সবর'-এর সাধারণ অর্থ হল, নফসকে বিরত রাখা। আর কুরআনে কারীমের পরিভাষায় নফ্সকে তার কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখা এবং আয়ত্বে রেখে দৃঢ়পদ থাকার নাম সবর।

আর تقوى (তাকওয়া) অর্থ খোদাভীরুতা। অন্য অর্থে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের নাম তাকওয়া।

ইসলামী ইতিহাসের প্রথম শতাব্দীতে যে সকল বস্তু মুসলমানদের রীতিনীতি ও স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল তা হল নামায, সবর ও তাকওয়া। এর ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং জিহাদের ময়দানে প্রকাশ্য বিজয় ও সফলতা দান করেছেন। আজও যদি আমরা তা অবলম্বন করি তাহলে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর ফেরেশতাকুলের মদদ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। প্রকৃত কথা এই ঃ

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

"বদরের পরিবেশ তৈরী কর, আকাশ থেকে এখনও দলে দলে ফেরেশতা তোমার মদদে অবতীর্ণ হতে পারে।"

জিহাদের প্রস্তুতি এবং জিহাদের হাতিয়ারের ব্যবস্থা করাও ফরয

সবর ও তাকওয়া এবং আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান ও ভরসা তো মুসলমানদের মূল ও দুর্দমনীয় শক্তি। তার সাথে এ-ও আবশ্যক যে, প্রত্যেক যুগোপযোগী ও স্থান ভেদে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ.

"আর প্রস্তুত কর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালন কর ঘোড়া, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর।" –সূরা আনফাল

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা জিহাদের জন্য শরীর চর্চা ও অনুশীলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সে যুগে যুদ্ধের যে সকল সরঞ্জাম ছিল সেগুলো সংগ্রহ করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। জিহাদের জন্য ঘোড়া, উট, লৌহবর্ম ও যুদ্ধ পোশাক ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন। তীরনিক্ষেপ ও হাতের নিশানা ঠিক করার প্রশিক্ষণেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যুদ্ধাস্ত্রের কারিগরি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন

হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) 'আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া' নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুজন সাহাবী হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ ও গাইলান ইবনে আসলাম (রাঃ) এক জিহাদে নবীজীর সাথে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তারা কিছু যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি শিখতে দামেস্কের প্রসিদ্ধ শিল্প শহর 'হায়রাশ'-এ গিয়েছিলেন। যেহেতু সেখানে দাব্বাবা ও যব্বূর নামের বড় বড় গাড়ি তৈরী করা হত যা বর্তমানে ট্যাংকের ন্যায় উপকারে আসত। এমনিভাবে মিনজানীকের কারিগরিও সেখানে ছিল যদ্বারা ভারী-ভারী পাথর নিক্ষেপ করে দূর্গ ভাঙ্গতে কামানের কাজ নেওয়া হত। এই সকল কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য সে সকল সম্মানী ব্যক্তিগণ সিরিয়া গিয়েছিলেন।

এ ঘটনা দ্বারা এটি প্রমাণিত হল যে, মুসলমানদের জন্য জরুরী হল, তারা নিজেদের হাতিয়ার ও যুদ্ধাস্ত্রে স্বনির্ভর হবে; অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না। কেননা, তাঁদের পক্ষে সে দেশ থেকে এসব গাড়ী ও মিনজানীক ক্রয় করে আনাও সম্ভব ছিল; কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তা করেননি; বরং তৈরী করার যোগ্যতা অর্জন করে নিজ দেশে তা তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন। আমাদেরও কর্তব্য হল এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো রূহানী ও খোদা প্রদত্ত মদদ ছিল; জাগতিক কোন হাতিয়ারের প্রয়োজনই ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি হাতিয়ার তৈরীর এত গুরুত্বারোপ করেছেন। এমতাবস্থায় আমাদের মত দুর্বল ঈমানদার ও গুনাহ্গার লোকদের এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু হওয়া দরকার তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমান যুগে যুদ্ধের জন্য যত রকমের হাতিয়ার, সরঞ্জামাদি ও মারণাস্ত্রের প্রয়োজন তার কোন কিছু থেকেই পিছপা না হওয়া উচিত। আর এরই সাথে সাথে কৌশলের মাঝে লেগে যাওয়া উচিত, যেন অতি শীর্ঘই সেগুলো নিজ দেশে তৈরী করা যায় এবং নিজ দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা যায়। (আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন।)

রিবাত তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত সংরক্ষণ

জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর একটি কাজ হল ইসলামী সীমান্তগুলো শত্রুর আক্রমণ থেকে হিফাযত করা; এটিকে কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের পরিভাষায় رباط (রিবাত) বলা হয়। আর জিহাদের মত এ কাজেরও বড় ফযীলত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাআত এই কাজকে অন্যান্য কাজসমূহের উপর প্রাধান্য দিয়ে সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত থেকেছেন।

আজকাল এই কাজের আঞ্জাম পুলিশ, বিডিআর'রা দিচ্ছে। যদি নিয়তের মধ্যে ইখলাস এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অনুভূতি থাকে তবে বেতন নেওয়া সত্ত্বেও তারা رباط (রিবাত) এর সওয়াব পাবে।

সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "একদিন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সীমান্ত পাহারা এক মাস রোযা রাখা ও রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা উত্তম। আর যদি এ অবস্থায়ই সে ইন্তেকাল করে তবে যে নেক আমল সে জীবিত

অবস্থায় করত তা মৃত্যুর পরও আমল নামায় একাধারে লেখা হতে থাকবে এবং কবরের সওয়াল-জওয়াব ও আযাব থেকে মুক্তি পাবে।"

তবরানীর রেওয়ায়াতে এ-ও আছে যে, "এক ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন শহীদদের সাথে উঠানো হবে এবং কেয়ামতের ভয়াবহ আযাবের মধ্যেও সে নিরাপদে থাকবে।" –ফাতহুল কাদীর

'রিবাত' এর অর্থ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়া। আর বাহ্যতঃ এ-ই যে, এই কাজ একমাত্র সে স্থানেই হতে পারে যেটি ইসলামী দেশের শেষ সীমায় অবস্থিত।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যুদ্ধের কলাকৌশলের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। কেননা, সর্বত্রই বিমানসেনা অবতরণ করতে পারে। বোমারু বিমানের সাহায্যে যে কোন স্থানে বোমা নিক্ষেপ করা যায়। তাই যে স্থানেই শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে সেখানকার হেফাযতের দায়িত্বও এই সীমান্তপাহারার অন্তর্ভুক্ত হবে।

পূর্ববর্তী ফকীহ তথা ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণও রিবাতের ব্যাপারে এমনটিই বলেছেন যে, "যে এলাকার উপর একবার শত্রুর হামলা হয় সে এলাকার হেফাযত চল্লিশ বছর পর্যন্ত রিবাতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকে।" –ফাতহুল কাদীর ঃ ৪/২৭৮

পাকিস্তানের অতীত যুদ্ধে সেরগুদা, পেশোয়ার ও করাচী ইত্যাদি স্থানসমূহ যেখানে বিমান সেনাদের অবতরণের আশংকা হত এবং শত্রুদের বোমারু বিমান বোমা নিক্ষেপ করেছে সেগুলোর হেফাযত সর্বদা রিবাতের হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত।

এ এমনই এক জিহাদ যেখানে প্রত্যেক শহরবাসী নিজ শহর বা গ্রামে বসে থেকেও রিবাতের সওয়াব পেতে পারে। শর্ত হল ইখলাসের সাথে নিজ শহর এবং শহরবাসীদের হেফাযতের সংকল্প রাখা এবং সামর্থ অনুযায়ী কৌশল অবলম্বন করা।

কার্ফিউ পালনও সীমান্ত পাহারার অন্তর্ভুক্ত

এমন ভয় ও শংকার সময় যে সকল এলাকায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আলো না জ্বালানো বা অন্ধকার রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় তাদের সে নির্দেশ পালনও হেফাযত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনাধীন হওয়ার কারণে সীমান্ত পাহারার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ইনশাআল্লাহ এতে রিবাত তথা সীমান্ত পাহারার মহান সওয়াবের অধিকারী হবে। মুসলমানরা যেন এতে সংকীর্ণমনা না হয়; বরং বিনা পরিশ্রমে সীমান্ত পাহারার সওয়াব হাসিল করার উপর খুশী হয়ে কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

নববী যুগে কার্ফিউ পালনের দৃষ্টান্ত

যুদ্ধ পরিস্থিতি ও এর চাহিদা প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশে ভিন্নতর হয়ে থাকে। দেশের বুদ্ধিজীবী, প্রজ্ঞাবান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গ যে সকল বিষয়কে শহর প্রতিরক্ষার জন্য জরুরী মনে করেন, তা বাস্তবায়ন করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী হয়ে পড়ে। ইসলামের প্রাথমিক যুগগুলোতে এ বিষয় বা পদ্ধতির কোন প্রমাণ পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক। কেননা, বৈধ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে মাসআলার ভিত্তি হল আমীরের আনুগত্য। আর আমীরের আনুগত্যের প্রমাণ কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এটিই সকল বৈধ বিষয়াবলীর নির্দেশ মান্য করার মূল হেতু। তবে বিশেষ কোন প্রক্রিয়া যদি সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকেও বর্ণিত থাকে তাহলে তো তা শরীয়তসম্মত হওয়া এবং মোবারক আমল হওয়াই প্রতীয়মাণ হয়।

পাকিস্তানে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শহর প্রতিরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান রাতে আলো জ্বালানো নিষেধ করেছিলেন। আমীরের নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য বিধায় তা বাস্তবায়ন করাই জরুরী ছিল। ঘটনাক্রমে এর একটি দৃষ্টান্ত নবুওয়তের যুগেও পাওয়া যায়, যা পাঠকবৃন্দের চিত্ত প্রশান্তি ও ঈমানকে দৃঢ় করার নিমিত্ত এখানে পেশ করা হল।

অষ্টম হিজরীর জুমাদাস সানী মাসে একটি বাহিনী পবিত্র মদীনা নগরী থেকে দশ মনযিল দূরে অবস্থিত লখম ও জাযাম গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। এর আমীর ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ)। এ যুদ্ধে শত্রু সেনারা নিজেদের পুরো বাহিনীকে জি-ঞ্জীরবেষ্টনীতে শক্তভাবে বেঁধে রেখেছিল; যেন কেউ পলায়ন করতে না পারে। এজন্যই এই যুদ্ধ 'যাতুস সালাসিল' (সিকলযুদ্ধ) নামে খ্যাত।

'জমউল ফাওয়ায়েদ' -এ 'মুজামে কাবীর'—তাবরানীর বরাতে উল্লেখ রয়েছে যে, গাযওয়ায়ে যাতুস সালাসিলের আমীর হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সেনাছাউনীতে রাতে আগুন বা কোন প্রকার আলো জ্বালানো যাবে না।

তিনদিন পর শত্রু বাহিনী পালাতে বাধ্য হল। শত্রুরা পালানোর সময় সাহাবায়ে কেরাম পশ্চাদ্ধাবন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সেনাপ্রধান হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) ধাওয়া করতে নিষেধ করলেন। উক্ত বাহিনীর বীর বাহাদূরদের নিকট আলো নিভিয়ে রাখার নির্দেশ বেশী পছন্দ হয়নি। অনুরূপ পশ্চাদ্ধাবন করার নিষেধাজ্ঞাও তাদের খারাপ লাগে। কিন্তু আমীরের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করা অত্যাবশ্যক ছিল। তাই এ উভয় নির্দেশই কোন প্রকারের ওযর-আপত্তি ব্যতিরেকেই মেনে নিতে হয়েছিল। মুজাহিদ বাহিনী পবিত্র মদীনা পৌছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অভিযোগ করেন। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর আমীর হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ)কে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) সবিনয়ে আরয করেন, হে রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা শত্রুর তুলনায় অনেক কম ছিল; এ জন্য আমি রাতে আলো জ্বালাতে নিষেধ করেছি। খোদা না করুন! যাতে তারা আমাদের সংখ্যা লঘিষ্টতার অনুমান করে নির্ভীক না হয়ে যায় এবং তাদের সাহস বেড়ে না যায়।

আর পশ্চাদ্ধাবন করা থেকেও এজন্য বাধা প্রদান করেছি যেন আমাদের স্বল্পসংখ্যক সৈন্য শক্রর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লে তারা যেন পাল্টা আক্রমন না করে বসে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই যুদ্ধকৌশল পছন্দ করেন এবং এর উপর আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরযে কেফায়া

শরীয়তের পরিভাষায় ফরযে কেফায়া এমন ফরয আমলকে বলা হয়, যার সম্পর্ক বিশেষভাবে প্রত্যেক মুসলমানের সাথে নয়; বরং সামগ্রিকভাবে পুরো মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে। এ জাতীয় ফরযের হুকুম হল, যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক মানুষ এই ফরয আদায় করে তবে অবশিষ্ট সকল মুসলমান এ থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। আর যদি কেউই আদায় না করে (তাহলে যাদের নিকট এর সংবাদ পৌঁছেছে আর তাদের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা আদায় না করে) তবে এ কারণে সবাই গুনাহগার হবে। যেমন মৃত মুসলমানের জানাযার নামায ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।

এই ফরয দায়িত্ব পুরো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর। নিকটতম আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা যদি এই ফরয আদায় করে নেয় তবে অবশিষ্ট সকল মুসলমান দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি মায়্যিতের এমন কোন নিকটাত্মীয় বিদ্যমান না থাকে বা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন কারণে অপারগতা পেশ করে তাহলে এলাকার অপর মুসলমানদের উপর সমভাবে এ ফরয বর্তাবে; তারা এর ব্যবস্থা করবে। যদি এলাকাবাসীও না করে, তাহলে উক্ত এলাকার অন্যদের উপর –যাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে– এ ফরয বর্তাবে। আর যদি তারাও না আদায় করে তবে এর পার্শ্ববর্তীদের উপর বর্তাবে। এমনিভাবে ইসলামের যতগুলো সমষ্টিগত ফরয ও ওয়াজিব আমল রয়েছে সেগুলোর হুমুক অনুরূপই। সবগুলোর হুকুম-বিধান এমনই।

দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা, দাওয়াত ও তাবলীগ তথা প্রচার-প্রসার, প্রয়োজন অনুসারে মসজিদ নির্মাণ করা, দ্বীনী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা; অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম ও গরীব-মিসকীনদের প্রয়োজন ও চাহিদা পুরণের জন্য দরীদ্রাগার, ইয়াতীমখানা ইত্যাদি নির্মাণ করা; জাহেল ও মূর্খদের দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা; সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ব্যবস্থা করা; ইসলাম বিদ্বেষী বা পথভ্রষ্টদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা; ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করা এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ইত্যাদি–এ আমল ও কাজগুলোর সবই এমন যা পুরো মুসলিম জাতির সাথে সম্পৃক্ত। এ জাতীয় ফরযসমূহ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নয়; বরং মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর সামগ্রিকভাবে এই দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। যাতে সকলের জন্য সহজ হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের উপর আরোপিত ফরযসমূহ আদায়ে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

পুরো কওম ও জাতির মধ্য থেকে যে পরিমাণ মানুষ এ কাজের প্রয়োজন পুরণ করতে পারে, তারাই যদি উক্ত কাজে আত্মনিয়োগ করে, তবে অবশিষ্টরা সবাই এ ফরয দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে। কেউ দ্বীনী শিক্ষার জন্য মাদ্‌রাসার ব্যবস্থা করবে; কেউ ফত্‌ওয়া ও পুস্তক লিখনীর প্রয়োজন মেটাবে; কেউ মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও তার ব্যবস্থাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করবে; কেউ ইয়াতীমখানা, দরীদ্রাগার, হাসপাতাল বা ফার্মেসী ইত্যাদি নির্মাণকার্য সম্পাদন করবে; কেউ কলম ও যবানের মাধ্যমে জিহাদ করে ইসলাম বিদ্বেষীদের সঠিক জবাব দানে আত্মনিয়োগ করবে; আর কেউ জিহাদ ও যুদ্ধের ফরয দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে।

জিহাদ ও কিতাল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى، وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ্ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।" –সূরা নিসা ঃ রুকূ ১৩

এই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, যদিও জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীর মর্যাদা আল্লাহ্ তাআলার নিকট বড়; কিন্তু যে লোক অন্য কাজের কারণে নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তাদের প্রতিও আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন। যদ্বারা বুঝা গেল যে, জিহাদ স্বীয় সমপর্যায়ভুক্ত ফরযসমূহের মত ফরযে কেফায়া।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً

এ আয়াতের মধ্যেও এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখনই মুসলমানদের একটি দল জিহাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় তখন আর সকলের উপর জিহাদ ফরয থাকে না।

ফরযে কেফায়া কখনো ফরযে আইনে পরিণত হয়

যদি কোন ফরযে কেফায়াআমল আদায়কারী কোন জামাআত বিদ্যমান না থাকে অথবা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অলসতা বা হীনবল হওয়ার কারণে তারা এ দায়িত্ব পালন না করে অথবা তাদের সংখ্যা ও হাতিয়ার এই ফরয দায়িত্ব আদায় করার জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাদের নিকটতম সকল মুসলমানদের উপর তা ফরযে আইনে পরিণত হয়। তারা এই ফরয আদায় করবে। আর যদি আদায়কারীদের জান বা মাল সংক্রান্ত কোন সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয় তবে তা-ও পুরণ করবে। নিকটবর্তী মুসলমারাও যদি অলসতা করে বা তারাও এই ফরয আদায়ের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে তাদের নিকটবর্তী শহর ও শহরতলীর

মুসলিম বাসিন্দাদের উপর এই দায়িত্ব বর্তাবে। এমনিভাবে যে পরিমাণ জান ও মাল সংক্রান্ত সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে; নিকটতম মুসলমানদের থেকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে সকল মুসলমানের উপর এই ফরয দায়িত্ব আরোপ হতে থাকবে। শুধু শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, অক্ষম ও বিকলাঙ্গ লোকেরা এই ফরয দায়িত্ব থেকে ছাড় পাবে। (হেদায়া ও বাদায়ে)

জিহাদ কখন ফরযে আইন হয়

যখন কাফেররা মুসলমানদের কোন জনপদের উপর আক্রমন করে, আর তা প্রতিরোধ করার জন্য দেশের মুসলিম বিচারক বা আমীর আম ও ব্যাপক নির্দেশ জারী করেন যে, যে সকল মুসলমান যুদ্ধের যোগ্য তোমরা সবাই যুদ্ধে শরীক হয়ে যাও, তখন সকলের উপর জিহাদে অংশ গ্রহণ ফরযে আইন হয়ে যায়। প্রতিরোধের তাকীদে মহিলাদের উপরও সামর্থ অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরয হয়ে যায়।

গাযওয়ায়ে তাবূকের মধ্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিভাবে আম ও ব্যাপক নির্দেশ জারী করেছিলেন। এ জন্যই যে সকল লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি তাদের উপর শাস্তির হুকুম জারী হয়েছিলেন।

বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলা ঃ এ জরুরী নয় যে, শহরের বিচারক ও আমীর –যে জিহাদের ঘোষণা দেয়– সে মুত্তাকী, খোদাভীরু অথবা আলেমই হতে হবে; বরং যে কোন মুসলমান বিচারক যখন এমন আম ও ব্যাপক হুকুমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন সে এই হুকুম দিতে পারে। আর সকল মুসলমানের উপর তার হুকুম মান্য করা জরুরী বা ফরয। (ফাতহুল কাদীর ঃ ৪/২৮০)

ফায়েদা ঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধের আমীর আলেম ও মুত্তাকী হওয়া বিজয় ও সফলতার কারণ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কাউকে জিহাদের আমীর নিযুক্ত করতেন তখনই তাঁকে অসিয়ত করতেন যে, নিজেও তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজের সাথীদেরকেও এ শিক্ষা দিবে। আর এটিই মুসলমানদের ঐ আসল অমূল্য সম্পদ যার কারণে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাদেরকে পরাজিত করতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমান আমীর ও বিচারকের অধীনে জিহাদ করা জরুরী এবং তার জায়েয নির্দেশের অনুসরণ করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ জিহাদ যখন ফরযে কেফায়া থাকে তখন ছেলের জন্য মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যাওয়া জায়েয নেই। কেননা, তাদের খেদমত ও কথা মান্য করা ফরযে আইন।

এমনিভাবে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত জিহাদের কাজে আত্মনিয়োগ করা জিহাদ ফরযে কেফায়া হওয়া অবস্থায় জায়েয নেই। হ্যাঁ, যদি শত্রুদের তীব্র আক্রমণের কারণে মুসলিম বিচারক সকলকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ জারী করে এবং তা ফরযে আইন হয়ে যায় তখন সন্তান পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বীয় ফরয পূর্ণ করবে। –আল বাদায়িউস সানায়ে ঃ ৭/৯৮

মাসআলা ঃ জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা কবীরাগুনাহ এবং গযবে ইলাহীর কারণ। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَـاَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ آمَـنُـوْا اِذَا لَقِـيْـتُـمُ الَّذِيْـنَ كَـفَـرُوْا زَحْـفًـا فَـلَا تُـوَلُّـوْهُـمُ الْاَدْبَـارَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে তখন পশ্চাৎপদ হয়ো না।"

মাসআলা ঃ মুজাহিদদের নিজেদের অবস্থানের ব্যাপারে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, যদি আমরা এ সময়ে যুদ্ধ করি তাহলে আমরা সকলেই

ধ্বংস হয়ে যাব অথচ শত্রুদের কোন ক্ষতি করতে পারব না; এমতাবস্থায় তাদের জন্য শক্তি অর্জন করে পুনরায় আক্রমনের নিয়তে পশ্চাৎপদ হওয়া জায়েজ হবে। অতঃপর অন্যান্য মুসলমানদের সহযোগিতায় যুদ্ধোপকরণ ও শক্তি অর্জন করতঃ আক্রমণ চালাবে। বিষয়টি মুজাহিদদের সংখ্যা ও হাতিয়ারের কম-বেশীর উপর নয়; বরং যুদ্ধক্ষেত্রের সমষ্টিগত অবস্থা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অভিজ্ঞতাই তার ফয়সালা করতে পারে যে, এ স্থানে যুদ্ধ করা উপকারে আসবে, নাকি পিছে হটে আসা উপকারী হবে।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ.

"আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাতে ফিরে আসবে, অবশ্য যে লড়াইয়ে কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।"

এ দ্বারা বুঝা গেল যে, যুদ্ধের কৌশলের জন্য অথবা মুসলমানদের সাহায্য হাসিল করার জন্য পশ্চাৎপদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যখন ভেগে যাওয়া উদ্দেশ্য না হয়; বরং পুনরায় ফিরে আসা উদ্দেশ্য হয়।

জরুরী সতর্কীকরণ

'বাদায়িউস সানায়ে'-এর লেখক বলেন,"উক্ত কথার দ্বারা এ-ও বুঝা গেল যে, কুরআন কারীমের এ ইরশাদ ঃ

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفًا.

"যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে বিজয়ী

হবে দু'শোর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশো লোক, তবে বিজয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর।" এই আয়াত মানসূখ হয়নি। আজও এমনটি হতে পারে।"

তাই তো পাকিস্তানের সাবেক জিহাদে বিশেষ করে লাহোর রণাঙ্গনে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করা গেছে, যা শক্রুরাও অস্বীকার করতে পারেনি; মুসলমানদের অতি স্বল্প সংখ্যক লোক বিশাল শক্র বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করেছে এবং বিজয় লাভ করেছে।

যদি এমন জায়গা পরিদৃষ্ট হয় যে, স্বল্প সংখ্যক বা স্বল্প হাতিয়ার থাকা সত্ত্বেও মুসলমান বিজয়ী হতে পারে তাহলে শুধু সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা জায়েয হবে না।

মাসআলা ঃ শক্রুদের যে সকল মহিলা, বৃদ্ধ অথবা ছোট বাচ্চারা যুদ্ধের ময়দানে গোয়েন্দার কাজ করতে পারে অথবা যুদ্ধের অন্য কোন কাজ আঞ্জাম দিতে পারে, তাদেরকে যুদ্ধ অবস্থায় হত্যা করতে হবে, যেন তাদের ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট হতে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।

কিন্তু যদি ছোটরা কয়েদ হয়ে যায় তাহলে বন্দী হওয়ার পর .র তাদেরকে হত্যা করা জায়েয নেই। সে প্রকাশ্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করুক বা না করুক। কেননা, বন্দী হওয়ার পর তাদের ব্যাপারে কোন আশংকা নেই। এখন যদি হত্যা করতে হয় তবে তার পিছনের কাজের শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হবে। অথচ বাচ্চা ও ছোট ছেলেমেয়েদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা শরীয়তে জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ জিহাদের ময়দানে যদি কোন মুসলমান তার কাফের পিতার মুখোমুখী হয়ে যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত পিতা আক্রমন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর আক্রমন করা জায়েয নেই। কেননা, কুরআন কারীমের হেদায়াত হল এই যে, দুনিয়াতে কাফের মাতা-পিতার সাথেও সদাচারণ কর এবং তাদের খেদমত ও দেখাশুনা কর। তাই জিহাদের সময়ও প্রথমত তাকে হত্যা করা জায়েয নেই।

হযরত হানযালা (রাঃ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কাফের পিতাকে হত্যার অনুমতি চাইলে তিনি নিষেধ করেন। তবে যদি পিতা পুত্রের উপর হামলা করে বসে আর এই আক্রমণ থেকে পিতাকে হত্যা করা ব্যতীত স্বীয় জান বাঁচানো সম্ভব না হয় তবে নিজেকে হেফাযত করা উচিত। এটি পিতাকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা নয়। –বাদায়িউস সানায়ে ঃ ৭/১০২

মাসআলা ঃ যুদ্ধে যাওয়ার সময় তেলাওয়াতের জন্য নিজের সাথে কুরআন কারীম তখনই রাখা জায়েয যখন মুসলমানদের শক্তি দৃঢ় ও শক্ত হয়; শহীদ কিংবা বন্দী হয়ে যাওয়ার আশংকা কম থাকে। আর যেখানে এমন আশংকা থাকে সেখানে কুরআন কারীম সাথে রাখবে না। এতে বেআদবীর সমূহ আশংকা রয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর ভূমিতে কুরআন কারীম নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। এটি এমন অবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত। –আল বাদায়িউস সানায়ে

মাসআলা ঃ যুদ্ধের যে সকল লোকদেরকে হত্যা করা জায়েয তাদেরকে বিকৃত করা তথা নাক, কান ইত্যাদি কর্তন করা জায়েয নেই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ থেকে বারণ করেছেন।

মাসআলা ঃ মুসলমানদের হাতে যেসব যুদ্ধবন্দী থাকে তাদেরকে ক্ষুধা ও পিপাসা ইত্যাদিতে কষ্ট দেওয়া জায়েয নেই। –আল বাদায়িউস সানায়ে

মাসআলা ঃ কাফের বন্দীদের সাথে নিজেদের মুসলমান বন্দীদেরকে পরিবর্তন করে নিয়ে আসা জায়েয আছে। (সাহেবাঈনের উক্তি মোতাবেক, আল বাদায়িউস সানায়ে)

মাসআলা ঃ প্রয়োজনে দুশমনদের বৃক্ষাদি, ক্ষেত ইত্যাদি কেটে বা জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেওয়াও জায়েয আছে। –আল বাদায়িউস সানায়ে

মাসআলা ঃ দুশমন যদি দূর্গে আবদ্ধ হয়ে যায় অথবা কোন নিরাপদ স্থানে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে অস্ত্র সমর্পণ করা এবং

বশ্যতা স্বীকার করার দাওয়াত দিতে হবে। তা না মানলে আগুন লাগিয়ে বা পানিতে ডুবিয়ে অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে দূর্গ ও স্থানকে ধ্বংস করে দেওয়াও জায়েয আছে। –আল বাদায়িউস সানায়ে

মাসআলা ঃ দুশমন যদি দূর্গে আবদ্ধ হয়ে যায় আর এ কথা জানা যায় যে, দুশমনদের চাকুরীতে কিছু মুসলমানও আছে; তবে তাদের কারণে শত্রুদের আক্রমনে কোন প্রকার ছাড় দেওয়া যাবে না; এমতাবস্থায় যদি মুসলমানদের রক্ষা করা যায় তাহলে তাদের রক্ষা করার চিন্তা-ফিকির করবে; অন্যথায় দুশমনকে ধ্বংস করার ইচ্ছায় গোলা বর্ষন করবে। যে সকল মুসলমান তার নিশানায় ইচ্ছা-বিহীন এসে যায় তা মাফ। কেননা, কাফেরদের কোন শহর বা গ্রাম মুসলমান থেকে খালী নেই। যদি তাদের কারণে দুশমনদের মোকাবেলা ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে যুদ্ধের পথই বন্ধ হয়ে যাবে। –আল বাদায়িউস সানায়ে ঃ ৭/১০০

মাসআলা ঃ এই পন্থা সে সময়ও অবলম্বন করা যাবে যখন দুশমনরা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য মুসলমান বন্দীদেরকে অথবা বাচ্চাদেরকে সম্মুখভাগে তুলে ধরবে। এমতাবস্থায়ও যদি মুসলমানদেরকে বাঁচানোর কোন পন্থা না থাকে তবে দুশমনের উপর আক্রমণের নিয়তে হামলা করা যাবে। আর যে সকল মুসলমান তার নিশানায় এসে যায় তা মাফ। –আল বাদায়িউস সানায়ে

সরাসরি যুদ্ধ ও কিতালের ময়দানেও এমন কাফেরদেরকে হত্যা করা জায়েয নেই যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যেমন বাচ্চা, মহিলা, বৃদ্ধ, অন্ধ, পাগল ও পঙ্গু; মন্দির ও উপাসনালয়ে উপাসকদেরকে; তবে শর্ত হল তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে হবে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন কাফের মহিলাকে হত্যাকৃত অবস্থায় পেয়ে খুব আফসোস প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, এ তো যুদ্ধা ছিল না, তাকে কেন হত্যা করা হল।

জিহাদের ফযীলত সম্পর্কে
চল্লিশ হাদীস

জিহাদের ফাযায়েল ও মাসায়েল সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তা লিখতে গেলে পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি পাবে। এই পুস্তিকায় সেসব হাদীস থেকে মাত্র চল্লিশটি হাদীস লেখা হল। এই চল্লিশ সংখ্যার মধ্যে এক বিশেষ উপকারিতাও রয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার চল্লিশটি হাদীস শিক্ষা করে তা আমার উম্মতকে পৌঁছে দেয় তবে কেয়ামতের দিন তার হাশর হবে মাকবূল উলামায়ে কেরামের সাথে। আল্লাহ তাআলা এই বরকত লিখক ও প্রকাশক উভয়কে নসীব করুন।

١-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ».

১–হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সকল কিছুর মূল হল ইসলাম; আর ইসলামের স্তম্ভ (যার উপর এটি সুপ্রতিষ্ঠিত) হল নামায; আর এর সর্বোচ্চ স্থান হল জিহাদ।" –মুসনাদে আহমাদ, জামে তিরমিযী –মিশকাত

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানদের সম্মান ও শক্তি জিহাদের উপরই নির্ভরশীল। যখন তারা জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

٢-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللّٰهِ، لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَّلاَ صَلاَةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ».

২–হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলার রাহের মুজাহিদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির ন্যায় যে সর্বদা রোযা রাখে, নামাযে দণ্ডায়মান থাকে; আল্লাহ তাআলার কথা মানে এবং মুজাহিদ ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও রোযা ও নামায থেকে বিরতী গ্রহণ করে না।" –সহীহ বুখারী ও মুসলিম

٣-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ، فَأَقَمْتُ فِيْ هٰذَا الشِّعْبِ. فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلاَ تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ، وَيُدْخِلُكُمُ الْجَنَّةَ، اغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَّجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

৩–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী কোন পাহাড়ের উপত্যকায় এক ঝর্ণায় পৌঁছলেন। ঝর্ণাটি সুন্দর ও পরিষ্কার দেখে তার পছন্দ হল এবং মনে মনে ধারণা করলেন যে, ইবাদতের জন্য এ স্থানটি খুবই উপযোগী। আমি লোকালয় ছেড়ে এখানেই অবস্থান করব। অতঃপর যখন তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন তখন আপন খেয়াল তাঁর

খেদমতে পেশ করলেন। তিনি ইরশাদ করেন, "এমনটি করো না। কেননা, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদে দণ্ডায়মান হওয়া নিজ বাড়ীতে সত্তর বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম। তোমরা কি এটা কামনা কর না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করুক; তোমাদের জান্নাত দান করুক? যাও, তোমরা আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ কর। যে ব্যক্তি সামান্য সময়ের জন্যও আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" –জামে তিরমিযী

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হল যে, জিহাদের প্রয়োজনের সময় জিহাদ করা নির্জনে বসে ইবাদত করার চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ।

٤-عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِّنْ صَلَاتِهِ سِتِّينَ سَنَةً».

৪–হযরত আবু উমামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ঐ সত্তার কসম যার কুদরতী হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন! আল্লাহ তাআলার রাহ–জিহাদের ময়দানে এক সকাল বা এক বিকাল বের হওয়া সারা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তা অপেক্ষা উত্তম। আর জিহাদের কাতারে দণ্ডায়মান হওয়া বাড়ীতে ষাট বছর নামায অপেক্ষা উত্তম।" –মুসনাদে আহমাদ

٥-عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قفلة كغزوة».

৫–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "জিহাদ থেকে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করা জিহাদে যাওয়ার সমতুল্য।" –সুনানে আবু দাউদ

٦-عَنْ أَبِيْ مُوسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسٰى! أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَجَعَ إِلٰى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ بِهِ حَتّٰى قُتِلَ».

৬–হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "জান্নাতের দরজা তরবারির ছায়াতলে। একথা শোনে এক রিক্তহস্ত ব্যক্তি উঠে বলল, হে আবূ মূসা! তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা ইরশাদ করতে শোনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (আমি শোনেছি)। এই লোক ততক্ষণাত নিজের সাথীদের নিকট ফিরে আসল এবং তাদেরকে আখেরী সালাম করল। অতঃপর তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেলে দিল এবং নাঙ্গা তরবারি হাতে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুমুল যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে ধন্য হল।" –সহীহ মুসলিম

٧-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: شَهِيْدٌ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ».

৭–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "প্রথম প্রবেশকারী তিন জান্নাতীকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। ১. আল্লাহ তাআলার রাহে শহীদ, ২. ঐ মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তি যে তালাশ ও চেষ্টা করে করে সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, ৩. ঐ গোলাম যে

আল্লাহ তাআলার ইবাদতও ভালভাবে করেছে এবং স্বীয় মুনীবের খেদমতের মধ্যেও ত্রুটি করেনি।" –জামে তিরমিযী

৮-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبْشِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقِيَامِ. قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ. قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هَاجَرَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ. قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ».

৮–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি ইরশাদ করেন, (নফল নামাযে) সুদীর্ঘ কিয়াম। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম সদকা কোনটি? তিনি ইরশাদ করেন, যে গরীব নিজের পারিশ্রমিক থেকে খরচ করে। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম হিজরত কোনটি? তিনি ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির হিজরত ও পরিত্যাগ সর্বোত্তম, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ঐ বস্তু পরিত্যাগ করে যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি ইরশাদ করেন, যে স্বীয় জান ও মাল দ্বারা মুশরেকদের সাথে জিহাদ করে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, কোন ধরনের শাহাদাত অধিক উত্তম? তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজেও শহীদ হয়েছে এবং তার ঘোড়াও শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।" –সুনানে আবু দাউদ

৯-عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ مَّرْفُوعٍ «مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَّفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ:

أَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ، وَلَكِنْ بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِئَةُ عَامٍ».

৯–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোন দুশমনের দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করবে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার একটি দরজা বৃদ্ধি করে দিবেন।"

ইবনে নাজ্জার (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'দরজা' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? তিনি ইরশাদ করেন, তা তোমার মায়ের দরজা তথা দ্বার ও দেহলীজ নয়; বরং এটি জান্নাতের দরজা ও স্তর। এর দুই দরজার মাঝে একশত বছরের দূরত্ব বিদ্যমান।" –সুনানে নাসায়ী

١٠-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا».

১০–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "এক সকাল আল্লাহ তাআলার রাহে বের হওয়া এবং এক বিকাল আল্লাহ তাআলার রাহ–জিহাদে বের হওয়া সারা দুনিয়া ও এর মধ্যস্থিত সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম।" –সহীহ মুসলিম

١١-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلٰى بَنِيْ لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ، فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا».

১১–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদের এক বাহিনী হুযাইল অন্তর্ভুক্ত বনী লিহইয়ান গোত্রের মোকাবেলায় প্রেরণ করেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামকে এই হুকুম দিলেন যে, প্রতি দুইজনের মধ্য থেকে একজন যুদ্ধে যাবে; (অপরজন ঘরের

প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করবে।) এমতাবস্থায় জিহাদের সওয়াব উভয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে।" –সহীহ মুসলিম

শহর প্রতিরক্ষার খেদমতও জিহাদতুল্য

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হল যে, জিহাদ শুধু রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার নামই নয়; বরং যারা নিজের এবং অন্যান্যদের বাড়ী-ঘর হেফাযতের জন্য বাড়ীতে থাকবে তারাও মুজাহিদ। কেননা, রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সিপাহীদের এরা সাহায্য করছে। তা এইভাবে যে, তাদের পরিবার-পরিজন এবং ঘর-বাড়ীর হেফাযত করতঃ তাদেরকে চিন্তামুক্ত রাখছে। আমাদের দেশে শহরবাসীদের প্রতিরক্ষাকল্পে খেদমত আঞ্জাম দাতারা যে খেদমতই আঞ্জাম দিক না কেন এতে তারা আল্লাহ তাআলার নিকট মুজাহিদদের আওতাভুক্ত হবে।

জিহাদের নিয়ত

١٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ -وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ- إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، اَللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ».

১২–হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে –আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন তাঁর রাস্তায় কে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে– সে কেয়ামতের দিন এভাবে উপস্থিত হবে যে, তার যখম থেকে রক্ত ঝড়তে থাকবে। রং হবে রক্তের; কিন্তু সুগন্ধি হবে মেশ্‌ক আম্বরের।" –সহীহ বুখারী ও মুসলিম

ফায়েদা ঃ এ হাদীসে যে বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন তাঁর রাস্তায় কে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে" এ দ্বারা এই কথার

প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নাম, যশ ও প্রসিদ্ধি বা অন্য কোন পার্থিব ফায়েদা হাসিলের নিয়তে যুদ্ধ করেছে ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে সে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি। সে এই ফযীলত পাবে না; বরং এই ফযীলত কেবল সে ব্যক্তিই পাবে যে ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাযত এবং মুসলিম রাষ্ট্র থেকে দুশমনদের উৎখাত ও প্রতিরোধের নিয়তে জিহাদ করেছে।

١٣-عَنْ أَبِي مُوسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ».

১৩–হযরত আবু মুসা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ যুদ্ধ করে গনীমতের আশায়; কেউ যুদ্ধ করে সুখ্যাতির প্রত্যাশায়; আর কেউ যুদ্ধ করে স্বীয় বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শনের আকাঙ্খায়–এদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার রাহের সৈনিক কে? তিনি ইরশাদ করেন, একমাত্র আল্লাহ তাআলার কালিমা বুলন্দ করার মানসে যে লড়েছে শুধু সে-ই আল্লাহ তাআলার রাহের সৈনিক।" –সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

'রিবাত' তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা

١٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا».

১৪–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "একদিন 'রিবাত' তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারার কাজ দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে ততপেক্ষা উত্তম।" –সহীহ বুখারী ও মুসলিম

١٥- عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِيْ مَاتَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَإِنَّهُ يَنْمٰى لَهُ عَمَلُهُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ».

১৫–ফুযালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমলের উপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়। (মৃত্যুর পর তার আমলে কোন বৃদ্ধি হয় না।) কেবল আল্লাহ তাআলার রাহে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দিতে গিয়ে যে মৃত্যুবরণ করেছে তার আমল কেয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং কবরের ফেতনা তথা সওয়াল ও জওয়াব থেকে নিরাপদ থাকবে।" –সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী

١٦- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَّقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ».

১৬–সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শোনেছি, "একদিন ও একরাতের রিবাত তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত হেফাযত করা একমাস অবিরাম রোযা রাখা এবং সারা রাত নফল নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় অর্থাৎ কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত হেফাযত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে কেয়ামত পর্যন্ত তার সকল নেক আমল যা সে দৈনন্দিন করত তা তার আমলনামায় জারি থাকবে এবং তার রিযিক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অব্যাহত থাকবে এবং কবরের আযাব হতে নিরাপদ থাকবে।" –সহীহ মুসলিম

١٧-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ».

১৭–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "দু'টি চক্ষু এমন রয়েছে যাকে আগুন স্পর্শ করবে না। এক. যে চোখ আল্লাহ তাআলার ভয়ে কাঁদে। দুই. যে চোখ আল্লাহ তাআলার পথ–জিহাদে রাত জেগে পাহারা দেয়।"

পুলিশ-বিডিআরদের মহা সুসংবাদ

আজকাল সীমান্ত প্রহরারত বাহিনী যাদেরকে বিডিআর বলা হয় তাদের অনেকেই নিজকে কেবল একজন চাকুরীজীবী হিসেবেই মনে করে থাকে। যদি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসকে সামনে রেখে উক্ত সওয়াবের নিয়তে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয় তাহলে চাকুরীর সাথে সাথে এই মহা দৌলতও অর্জিত হবে। নিজের ও পারিবারিক প্রয়োজনে সে যে ভাতা গ্রহণ করে তাতে এই সওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হবে না। শর্ত এটাই যে, এই কাজ করার মধ্যে রিবাত তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তকে শত্রুর হাত থেকে হেফাযত করার নিয়ত থাকতে হবে।

١٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا؟ قُلْنَا: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: رَجُلٌ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ أَوْ يُقْتَلَ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِيْ يَلِيْهِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعْبِ، يُقِيْمُ

الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ شَرَّهُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: اَلَّذِيْ يَسْأَلُ بِاللّٰهِ، وَلَا يُعْطِيْ بِهِ».

১৮—হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান কে তা কি তোমাদেরকে বলব? আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললাম, হ্যাঁ; অবশ্যই বলবেন। তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ঘোড়া নিয়ে আল্লাহ তাআলার রাহে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত হেফাযতে আত্মনিয়োগ করে এবং সেখানে অবস্থানকালে মৃত্যুবরণ করে অথবা তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি আরো ইরশাদ করেন, আমি কি আরো তোমাদের বলব যে, ঐ ব্যক্তির নিকটতম মর্যাদাশীল কে? আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললাম, হ্যাঁ; অবশ্যই বলবেন। তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে অবস্থান নেয় এবং নামায ও যাকাত আদায় করে এবং লোকদেরকে নিজ কষ্ট থেকে বাঁচায়। অতঃপর তিনি আরো ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে খারাপ লোকের সন্ধান দেব? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ; অবশ্যই। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে অন্যের কাছে চায়; কিন্তু অন্যরা যখন তার কাছে আল্লাহ তাআলার নামে চায় তখন সে তাকে কিছুই প্রদান করে না।" –সুনানে তিরমিযী ও নাসায়ী

আল্লাহ তাআলার রাহে শহীদানের মর্যাদা ও সম্মান

১৯–عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلا الشَّهِيْدُ،

يَتَمَنّٰى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ».

১৯–হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "জান্নাতে প্রবেশকৃত ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে, তুমি দুনিয়াতে চলে যাও; বিনিময়ে পৃথিবীর রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদ তোমাকে দেওয়া হবে; তবুও সে জান্নাত থেকে বের হওয়ার জন্য রাজী হবে না। পক্ষান্তরে শহীদ পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে রাজী হবে, যেন সে জিহাদ করে শহীদ হতে পারে। এমনিভাবে শহীদ দশবার জীবিত হয়ে পৃথিবীতে আসতে চাইবে; যেহেতু সে আল্লাহ তাআলার রাহে শাহাদাত লাভের মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যক্ষ করেছে।" –সহীহ বুখারী ও মুসলিম

٢٠–قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيٰى ثُمَّ أُقْتَلَ، ثُمَّ أُحْيٰى، ثُمَّ أُقْتَلَ».

২০–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! আমার একান্ত আরযু যে, আমি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় লড়ব আর শহীদ হব; আবার জীবিত হব এবং শহীদ হব; আবার জীবিত হব এবং শহীদ হব।" –সহীহ বুখারী ও মুসলিম

শহীদের তিন স্তর

٢١–عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلْمٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْقَتْلٰى ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ جَاهِدٌ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: فِيْهِ فَذٰلِكَ الشَّهِيْدُ الْمُمْتَحَنُ فِيْ خَيْمَةِ اللّٰهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لاَ يَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ إِلاَّ النُّبُوَّةَ، وَمُؤْمِنٌ خَالِطٌ عَمَلاً صَالِحًا وَأخر سَيِّئًا جَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَصْمَصَةٌ مُحِتٌّ ذُنُوْبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِّلْخَطَايَا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ، مُنَافِقٌ جَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ، فَذٰلِكَ فِيْ النَّارِ، إِنَّ السَّيْفَ لاَ يَمْحُوْ النِّفَاقَ».

২১–হযরত উকবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "শহীদ তিন প্রকার। এক, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন ও নেককার। এমতাবস্থায় সে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় স্বীয় জান ও মাল দ্বারা যুদ্ধ করেছে। যখন দুশমনের সাথে লড়াই হয় তখন দৃঢ়পদ থেকে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছে। এমন শহীদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ-ই আসল শহীদ এবং পরীক্ষায় সফলকাম। এ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার আরশতলে স্থান পাবে। এর মাঝে এবং নবীগণের মাঝে কেবলমাত্র নবুওয়তের স্তরের ব্যবধান থাকবে।

দ্বিতীয়, যে ব্যক্তি মুমিন তো ঠিক; তবে কিছু নেক আমলও করেছে; কিছু বদ আমলও করেছে এবং স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছে। শত্রুর মোকাবেলায় লড়াই করতে করতে শহীদ হয়েছে। এমন শহীদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এর জিহাদ 'মাসমাসা' (তথা শিঙ্গার ন্যায় খারাপ ধাতু বহিষ্কারক) সকল গুনাহকে নিঃশেষ করে দেয় এবং তরবারি

সকল ভুলত্রুটি পরিশোধনকারী। এ ব্যক্তি যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

তৃতীয়, যে ব্যক্তি মুনাফেক। এ স্বীয় জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে মরেছে; (কিন্তু নিয়ত খালেস তথা আল্লাহ তাআলার জন্য ছিল না।) সে জাহান্নামে যাবে। কেননা, তরবারি কুফুরী ও নেফাক তথা কপটতার গুনাহ মিটাতে সক্ষম নয়।" –সুনানে দারেমী–মিশকাত

মুজাহিদের স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও সে শহীদ

২২–عَنْ أَبِيْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ».

২২–হযরত আবু সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি সত্য মনে আল্লাহ তাআলার নিকট শাহাদত প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাআলা তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন; যদিও বিছানার উপর তার স্বাভাবিক মৃত্যু হোক না কেন।" –সহীহ মুসলিম

২৩– عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ فَصَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ قَصَّهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيْرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ، فَإِنَّهُ شَهِيْدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ».

২৩–হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শোনেছি যে, যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য বের হয়, অতঃপর তার মৃত্যু এসে যায় অথবা কেউ

তাকে হত্যা করে, বাহন থেকে পরে মারা যায়, বিষধর কোন প্রাণী তাকে দংশন করে অথবা বিছানায় রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়–তবুও এ ব্যক্তি শহীদ এবং তার জন্য রয়েছে জান্নাত।" –সুনানে আবু দাউদ

সম্পদ ও জিহ্বা দ্বারাও জিহাদ করা যায়

٢٤-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ».

২৪–হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "মুশরেকদের বিরুদ্ধে তোমরা সম্পদ দ্বারা, জীবন দ্বারা এবং জিহ্বা ও যবান দ্বারা জিহাদ কর।" –সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী

ফায়েদা ঃ মালের জিহাদ হল জিহাদী কর্মকাণ্ডে ধন-সম্পদ খরচ করা; আর জিহ্বা বা যবানের জিহাদ হল জনগণকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং জিহাদের বিধানাবলী বর্ণনা করা; নিজের কথাবার্তা ও লিখনীর মাধ্যমে শত্রুদের প্রভাবিত করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে কবিতা-তারানা বা গজল যদ্বারা মুসলমানদের মাঝে জিহাদী স্পৃহা জাগ্রত হয় বা যদ্বারা শত্রুদের অবমাননা হয়–এও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রাঃ)। তিনি একজন সাহাবী কবি ছিলেন। তাঁর কবিতামালা মক্কার মুশরেকদের মোকাবেলায় পাঠ করা হত। এগুলোকেও জিহাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর লেখনীও জিহ্বার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে একই হুকুম রাখে।

জিহাদে সম্পদ ব্যয়ের সওয়াব

٢٥-عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ بِسَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ».

২৫–হুযাইম ইবনে ফাতিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাহ–জিহাদে সম্পদ খরচ করে তার সওয়াব সাতশত গুন অধিক লেখা হয়। অর্থাৎ যদি এক টাকা খরচ করে তাহলে সাতশত টাকা খরচ করার সওয়াব পাবে।” –সুনানে নাসায়ী

٢٦–عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَبِي أُمَامَةَ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَرْسَلَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَقَامَ فِيْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِئَةِ دِرْهَمٍ، مَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَنْفَقَ فِيْ وَجْهِهِ ذٰلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ».

২৬–হযরত আবুদ্দারদা, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আবু উমামা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ এবং ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহুম) সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য কিছু মাল ব্যয় করল তবে নিজে জিহাদে যেতে পারেনি তাকে এক দেরহামের বিপরীতে সাতশত দেরহামের সওয়াব দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদও করেছে এবং তাতে স্বীয় মালও খরচ করেছে তবে তার এক দেরহামের সওয়াব সাতলক্ষ দেরহাম সমতুল্য হবে।” –সুনানে ইবনে মাজা

٢٧–عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِخْدَامُ

عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ إِظْلَالُ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ».

২৭–হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, সর্বোত্তম সদকা কোনটি? তিনি ইরশাদ করেন, "জিহাদের জন্য কোন গোলাম দিয়ে দেওয়া অথবা মুজাহিদীনের উপর ছায়া দান করার জন্য কোন খিমা ও তার কজা প্রদান করা।" –জামে তিরমিযী

হিন্দুস্তানে জিহাদের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলত

২৮–عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَدَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيْهَا نَفْسِيْ وَمَالِيْ، فَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ.

২৮–হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে হিন্দুস্তানের জিহাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি (আবু হুরায়রা রাঃ) সে জিহাদ পাই তাহলে তাতে আমার জান ও মাল উৎসর্গ করে দিব। যদি সেখানে আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে আমি শ্রেষ্ঠতম শহীদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি (বিজয়ী হয়ে) ফিরে আসি সেক্ষেত্রে আমি দোযখ হতে মুক্ত আবু হুরায়রা হিসেবে বিচরণ করব।" –সুনানে নাসায়ী

ফায়েদা ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে এমন আজিমুশ্বান সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জিহাদে শহীদ হবে সেই সর্বোত্তম শহীদ হবে; আর যে ব্যক্তি গাজী হয়ে ফিরবে তাকে আল্লাহ তাআলা আযাব থেকে মুক্তি দিবেন।

হিন্দুস্তানের জিহাদের বিশেষ ফযীলত যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি অন্য হাদীসে হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হল ঃ

٢٩-عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ: «عُصْبَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَجَارَهُمَا اللّٰهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، عِصَابَةٌ تَكُوْنُ مَعَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ».

২৯-হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের দু'টি জামাআতকে আল্লাহ তাআলা দোযখের আগুন থেকে নাজাত দিয়েছেন। একটি দল হল তাঁদের যাঁরা হিন্দুস্তানের জিহাদে যোগদান করবে। অপর দলটি হল তাঁদের যাঁরা ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের পর তাঁর লস্করভুক্ত হয়ে জিহাদে অংশ নিবে।" -সুনানে নাসায়ী, মুজামে আওসাত-তবরানী

হিন্দুস্তানের জিহাদ বলতে কোন জিহাদকে বুঝানো হয়েছে?

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে হিন্দুস্তানের জিহাদ সম্পর্কে যে সকল ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে একটি প্রশ্ন জাগে যে, হিন্দুস্তানে জিহাদ তো হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ই হচ্ছে। সর্বপ্রথম সিন্ধু অভিমুখে মুহাম্মাদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে জিহাদ সংঘটিত হয়, যাতে কতক সাহাবী (রাঃ) এবং বহু তাবেয়ী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাহলে কি ঐ জিহাদ দ্বারা এ প্রথম জিহাদই উদ্দেশ্য, নাকি যত জিহাদ অতিবাহিত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে-সবই এর অন্তর্ভুক্ত?

হাদীসের শব্দের প্রতি চিন্তা-ফিকির করলে এটিই বুঝে আসে যে, হাদীসটিতে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী রয়েছে। এগুলোকে কোন

জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত ও নির্দিষ্ট করার কোন অবকাশ নেই। তাই যত জিহাদ হিন্দুস্তানের মাটিতে বিভিন্ন যুগে হয়েছে এবং পাকিস্তানের বর্তমান জিহাদ এবং ভবিষ্যতে কাফেরদের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানে যত জিহাদ হবে–সবই এই আজিমুশ্বান সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত। (একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সম্যক অবগত।)

জিহাদ বর্জনের হুঁশিয়ারী ও এর পার্থিব ক্ষতি

৩০–عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ».

৩০–হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কখনও জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদের ইচ্ছাপোষণও করেনি সে একপ্রকার নেফাকের উপর মৃত্যুবরণ করল।" –সহীহ মুসলিম

৩১–عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهٖ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

৩১–হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কখনো জিহাদ করেনি; কোন মুজাহিদের যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থাও করেনি কিংবা আল্লাহ তাআলার রাহে কোন মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের দেখাশোনাও করেনি –পার্থিব কোন উদ্দেশ্য বিহীন– তাহলে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের পূর্বেই এরূপ ব্যক্তির উপর আযাব নাযিল করবেন।" –সুনানে আবু দাউদ

জিহাদ বর্জন করা মানে সমূহ বিপদ ডেকে আনা

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল কোন না কোনভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করার শক্তি ও সাহস না থাকে তাহলে অন্ততঃ মুজাহিদের প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবস্থা করা। যদি এটিও সম্ভব না হয় তাহলে পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয়, বরং ইখলাসের সাথে মুজাহিদ পরিবারের খেদমত করবে। আর যে ব্যক্তি জিহাদের উপরোক্ত কোন কাজেই অংশ গ্রহণ করল না সে আল্লাহ তাআলার ভয়াবহ আযাব ও মুসীবত ডেকে আনল।

এমনও আশংকা ছিল যে, আল্লাহ তাআলা পাকিস্তানের মুসলমানদের জিহাদে অংশগ্রহণের যে সুযোগ দান করেছেন যদি আমরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতঃ জিহাদের প্রস্তুতি অব্যাহত না রাখতাম তাহলে যে বিপদাপদ ও মুসীবতের সয়লাব ধেয়ে আসছিল তা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসত। আল্লাহ তাআলা এ জিহাদের এই প্রস্তুতি গ্রহণের বরকতে পুরো পাকিস্তানকে মুক্তি দিয়েছেন।

৩২-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ».

৩২–হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সম্মুখে এমনতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার শরীরে জিহাদের কোন চিহ্ন নেই, তবে সে এক প্রকার দোষ ও ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হল।" –জামে তিরমিযী ও ইবনে মাজা

জিহাদের জন্য অস্ত্র এবং অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী তৈরী ও সরবরাহ করাও জিহাদ

৩৩-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: «وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ».

৩৩-হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করতে শুনেছি, "কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব।"

শোনে রেখো, এটি তীর নিক্ষেপের শক্তি; এটি তীর নিক্ষেপের শক্তি; এটি তীর নিক্ষেপের শক্তি।" -সহীহ মুসলিম

ফায়েদা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যুদ্ধ যেহেতু ঢাল-তলোয়ার ও তীরের মাধ্যমেই হত তাই তীর নিক্ষেপ ও নিশানাবাজির অনুশীলন ও যোগ্যতা অর্জনকেই শক্তি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে একথাও সুস্পষ্ট যে, এখন যুদ্ধ যেহেতু গোলাগুলি ও বোমাবাজির মাধ্যমে হয়ে থাকে তাই এগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি জানাও যুদ্ধের প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে। এ বিষয়ক অত্যাধুনিক বিভিন্ন মারণাস্ত্রের ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষার মাধ্যমেই কুরআন কারীমের উক্ত বিধানের উপর আমল করা হবে।

[আলোচ্য হাদীসে ইঙ্গিতকৃত আয়াতটির ব্যাখ্যা গ্রন্থকারের 'তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন' থেকে উদ্ধৃত হল।]

"উক্ত আয়াতে (وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব।) ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ করা এবং কাফেরদের সাথে

মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ "কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব।"

"এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ (যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব) এ শর্ত আরোপ করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরণের এবং যে পরিমাণ উপরকণ রয়েছে তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে; বরং সামর্থ অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ যোগাড় করতে পার তা-ই সংগ্রহ করে নাও। এতটুকুই যথেষ্ট-আল্লাহ তাআলার মদদ ও সাহায্য-সহযোগিতা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

"অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে যে, من قوة অর্থাৎ মোকাবেলা করার শক্তি সঞ্চয় করা। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত এবং শরীর চর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআন কারীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি; বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছে যে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তরবারী, বর্শা প্রভৃতি। তারপর বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা-রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এসব কিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে সে সবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে তাহলে তাও জিহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।" (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন)

٣٤-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبْعَهُ، وَرِيَّهُ، وَرَوْثَهُ، وَبَوْلَهُ فِيْ الْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৩৪–হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর পরিপক্ক ঈমান রেখে এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্য জ্ঞান করে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করবে কেয়ামতের দিন এ ঘোড়ার আহার, পানি ও মলমূত্র সে ব্যক্তির আমলের পাল্লায় রাখা হবে।" –সহীহ বুখারী

٣٥-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَ نَفَرٍ فِيْ الْجَنَّةِ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، فَارْمُوْا وَارْكَبُوْا، وَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا».

৩৫–হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা এক তীরের পরিবর্তে তিনজনকে জান্নাত দান করবেন। এক, যে ব্যক্তি জিহাদ ও সওয়াবের নিয়তে তীর বানিয়েছে; দুই, যে ব্যক্তি এটি নিক্ষেপ করেছে; তিন, যে ব্যক্তি এ তীরের অগ্র ও ফলা প্রস্তুত করেছে।

অতএব, তীরান্দাযী করতে থাক এবং ঘোড়া আরোহনের চর্চা কর। আর আমার নিকট তীরান্দাযীর অনুশীলন ঘোড়া আরোহনের অনুশীলন হতে অধিক উত্তম।" –জামে তিরমিযী

কোন গাজীকে জিহাদ সামগ্রী প্রদান বা তাঁর ঘরের খোঁজখবর নেওয়াও জিহাদ

٣٦-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْغَازِيْ أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِيْ».

৩৬–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "গাজী কেবল জিহাদের সওয়াব পায়, আর যে ব্যক্তি তাকে জিহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করল সে জিহাদ সামগ্রী দানের সওয়াবও পায়; আবার গাজীর জিহাদের সওয়াবও পায়।" –সুনানে আবু দাউদ

জিহাদ ফাণ্ডে দান করা বিরাট সওয়াব

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, জিহাদরত সৈন্যদের ভাতা অথবা অন্যান্য যুদ্ধোপকরণের জন্য অর্থ-সম্পদ দানকারীও মুজাহিদীনের জিহাদের সওয়াব পাবে।

٣٧-عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزٰى، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ فَقَدْ غَزٰى».

৩৭–হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জামাদি দান করে সামর্থবান করে তুলল সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদ পরিবারের দেখাশোনা এবং তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকল সেও যেন জিহাদ করল।" –সহীহ বুখারী ও মুসলিম

ঋণ ও আমানতের খিয়ানত ব্যতীত জিহাদ দ্বারা সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়

৩৮-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا إِلَّا الأَمَانَةَ، وَالْأَمَانَةُ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْأَمَانَةُ فِي الْحَدِيْثِ، وَأَشَدُّ ذٰلِكَ الْوَدَاعُ».

৩৮-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলার রাস্তায় শাহাদাত আমানতের খিয়ানত ব্যতীত সকল গুনাহ্র কাফ্ফারা। অতঃপর তিনি আরো ইরশাদ করেন, শুধু মালের আমানতই নয়; বরং নামায, রোযা ও কথাবার্তায়ও আমানত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমানত হল মালের আমানত যা কারো নিকট গচ্ছিত রাখা হয়েছে।" -তবরানী কাবীর

৩৯-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ».

৩৯-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলার রাস্তায় শহীদ হওয়া ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপের কাফ্ফারা। (তাই তা নিজে আদায় করা বা আদায়ের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া একান্ত কর্তব্য।)" -সহীহ বুখারী ও মুসলিম

নৌবাহিনীদের জন্য বিরাট সৌভাগ্য

৪০-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَرَسَ لَيْلَةً عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ

كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِبَادَةٍ فِيْ أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ». (رواه الموصلي بلين)

৪০–হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি এক রাত সমুদ্রকূলে পাহারা দিবে–এটি তার জন্য নিজ বাড়ীতে এক হাজার বছর ইবাদত অপেক্ষা উত্তম হবে।" –মুসনাদে আবু ইয়ালা

যুদ্ধকালীন জিহাদের দুআসমূহ

এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত দুআ উল্লেখ করা হল যেগুলো মুখস্ত করে নেওয়া কঠিন কিছু নয়। এসকল দুআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং এগুলো দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার জন্য উত্তম ও পরিক্ষিত ওযীফা।

শত্রুর মোকাবেলায় অতি কার্যকরী হাতিয়ার

বিশ্বজগতের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সত্যবাদী ব্যক্তি সায়্যিদুর রুসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أَلَا أَدُلُّكُمْ مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيُدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، تَدْعُونَ اللّٰهَ فِي لَيْلِكُمْ وَنَهَارِكُمْ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ».

"আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না? যা তোমাদেরকে শত্রু থেকে মুক্তি দিবে এবং তোমাদের জীবিকা বৃদ্ধির কারণ হবে? আর তা এই যে, তোমরা দিন-রাত আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করতে থাক। কেননা, দুআ হল মুমিনের হাতিয়ার ও অস্ত্র।" –মুস্তাদরাকে হাকেম

এই অস্ত্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে কোন বস্তুর মাধ্যম ব্যতীতই সবসময় প্রস্তুত করে রাখতে পারে। আর এই অস্ত্রের যথার্থতা ও কার্যকারিতার সাক্ষ্য আল্লাহ তাআলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং হাদীসে প্রদান করেছেন। তিনি প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে এই অস্ত্র ও হাতিয়ারের মাধ্যমে কাজ নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এই হাতিয়ার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাখো সিপাহসালার ও মুজাহিদদের সফলতাও দান করেছেন।

এই হাদীসের অপর এক রেওয়ায়াতে এ শব্দাবলীও এসেছে ঃ

اَلدُّعَاءُ سَلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ.

"দুআ মুমিনের অস্ত্র, দ্বীনের ভিত্তি এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের নূর।"
–মুস্তাদরাকে হাকেম

ইতিহাস সাক্ষী যে, ঈমানদারগণ যখনই দ্বীনের এই ভিত্তির সাহায্য নিয়েছেন এবং এই দুআর মশাল জ্বালিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তখনই আসমান-যমীনের সর্বশক্তি মুসলমানদের সাহার্যার্থে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়তে রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই সফলতা ও বিজয় অর্জিত হয়েছে।

পূর্ণ ইয়াকীন ও বিশ্বাস নিয়ে একান্তচিত্তে দুআ করতে হবে

সায়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলার দরবারে কবূলের পূর্ণ বিশ্বাস রেখে কায়মনোবাক্যে দুআ করতে হবে। কেননা, তোমার জেনে রাখা উচিত যে, অমনোযোগী, উদাসীন এবং যে ব্যক্তি দুআ কবূলের বিশ্বাস রাখে না আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবূল করেন না।" –জামে তিরমিযী–মিশকাত

আত্মিক দুর্বলতা ও কাপুরুষতার চিকিৎসা

١-اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

১–"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় কামনা করি এবং তোমার নিকট আরো আশ্রয় কামনা করি কৃপণতা থেকে; নিষ্ক্রীয় হায়াত ও বয়স থেকে এবং দুনিয়া ও কবরের আযাবের ফেতনা তথা পরীক্ষাসমূহ থেকে।"

٢- حَسْبِيَ اللّٰهُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

২–"আল্লাহ তাআলাই আমার জন্য যথেষ্ট; তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি; আর তিনি মহান আরশের মালিক।"

٣- حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

৩–"আল্লাহ তাআলাই আমার জন্য যথেষ্ট; তিনি অতি উত্তম যিম্মাদার, অতিউত্তম অভিভাবক এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী।"

٤- يٰا حَيُّ يٰا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

৪–"হে চিরঞ্জীব! হে সদা সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্তা! আমি তোমার রহমতে তোমারই দরবারে ফরিয়াদ করছি।"

٥- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

৫–"নেক কাজ করার এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি একমাত্র আল্লাহ তাআলারই হাতে; যিনি অতি মহান ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"

٦- اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৬–"হে আল্লাহ! তুমি যাকে কিছু দিতে চাও তা রোধ করার কেউ নেই; আর তুমি যাকে বঞ্চিত করতে চাও তাকে দেওয়ার কেউ নেই; তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক তা পাল্টাবার কেউ নেই এবং কোন বড় থেকে বড় সম্মানী ও সম্পদশালী এমন নেই, যাকে তার সম্মান ও মর্যাদা তোমার আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

যখন নিজকে অসহায় মনে হবে

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমারই রহমতের আশাবাদী। তুমি আমাকে

এক মুহূর্তের জন্যও আমার নফসের নিকট সোপর্দ করো না। তুমি আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দাও। তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।"

আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ের দূর্গ

হযরত আব্দুল্লাহ আসলামী (রাঃ) বলেন, আমরা এক উমরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। তিনি রাস্তা ছেড়ে টিলার নীচে আশ্রয় নেন। সারা রাত নামাযে মশগুল থাকেন। সকাল বেলা আব্দুল্লাহ আসলামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যান। তিনি আব্দুল্লাহ আসলামীর (রাঃ) বুকের উপর হাত রেখে সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) , সূরা ফালাক (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ও সূরা নাস (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) পড়ার কথা বলেন এবং ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই সূরাগুলো পড়ে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় কামনা করবে তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।" –মুসনাদে বাযযার

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক; আল্লাহ অমুখাপেক্ষী; তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।"

সূরা ফালাক

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

"বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনর্তার; তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে (খেজুরের ডাল, গমের দানা, এটম বিস্ফোরণের অর্থাৎ কাফেরদের ছোট-বড় কোন শক্তিই এমনকি এটম বোমাও তাঁর কর্তৃত্তাধীন এবং তাঁর অনুমতিক্রমেই সে কারো ক্ষতিসাধন করতে পারে। যদি অনুমতি না হয় তবে সে সম্পূর্ণ বেকার ও নিষ্ক্রীয়); অন্ধকার রাতের (ঘটনাবলী, আকাশপথের আক্রমণ, শক্রর ষড়যন্ত্র ও অনিষ্টতা) অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়; গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারীনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

সূরা নাস

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ. اِلٰهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

"বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির; মানুষের মা'বূদের (কেউ তার অধীনমুক্ত নয়, সে যত বড় শক্তিধর আর কাফেরই হোক না কেন।) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (যে তোমরা পরাজিত হবে, তোমাদের অবস্থা জানার কেউ থাকবে না) জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।"

যখন বিপদের সমূহ আশংকা থাকে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمْعِ سَخَطِكَ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার নেয়ামত হারানো থেকে আশ্রয় কামনা করছি; তোমার দানকৃত সুস্থতার পরিবর্তে মুসীবত থেকে;

এবং তোমার আকস্মিক ক্রোধ থেকে এবং সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে।”

শত্রুর সৈন্যবলের কারণে শংকিত হলে

খন্দকের যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখন তো আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ সময়কার জন্য কোন দুআ আছে কি? তিনি ইরশাদ করেন, হ্যাঁ; তোমরা এই দুআ কামনা কর–

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا.

“হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দুর্বলতা ঢেকে দাও এবং সমূহ বিপদ থেকে আমাদের নিরাপদ রাখ।”

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলেন, আমরা এদুআ করলে আল্লাহ তাআলা এমন প্রবল বায়ূ প্রেরণ করলেন যে, কাফেরদের মুখ থুবড়ে গেল।

জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের দুআসমূহ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। এর পূর্ণঙ্গতার একটি দিক এও যে, ইসলাম মানুষের প্রতিটি স্তরে তার রবের দিকে ধাবিত করে। এসকল স্তর ও পর্যায়সমূহের একটি হল যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। মুসলমানের যুদ্ধ যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যেই হয়ে থাকে তাই এ যুদ্ধ মুমিনের কলব ও অন্তকরণকে আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত করার একটি বড় মাধ্যম।

এ মর্মে কুরআন কারীমে মুমিনদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

“হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন শত্রু বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও তখন তোমরা অটল ও সুদৃঢ় থেকো এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”

তুমুল যুদ্ধের মুহূর্তেও আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করাকে সফলতার নিশ্চয়তা স্বরূপ বলা হয়েছে। এটি এমন একটি বাস্তব সত্য বিষয় যা এই উম্মত সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করেছে; বরং বাস্তব তো এই যে, ইসলামের প্রথম যুগে বদর যুদ্ধ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা যত যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতা হাসিল করেছে সেগুলোতে বীরত্ব, আত্মোৎসর্গ এবং আল্লাহ তাআলার রাহে ত্যাগ ও কুরবানীর বিস্ময়কর অবদানের কথা তো আছেই; এ কথা অস্বীকারের কোন অবকাশ নেই; তবে এরচেয়েও অনেক বেশী কার্যকরী ছিল মূল যুদ্ধের মুহূর্তেও মুসলমানদের অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার যিকির ও তাঁকে স্মরণ করা। এত অধিক পরিমাণে তারা রবের স্মরণ করেছেন যার ফলে তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত ও দয়া হয়েছে এবং সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধোপকরণ অতি অল্প হওয়া সত্ত্বেও তারা শত্রুবাহিনীর উপর কামিয়াব হয়েছেন।

মুজাহিদগণ জিহাদ ও সশস্ত্র সংগ্রামের ইচ্ছার প্রারম্ভ থেকে নিয়ে বিজয় ও সফলতা পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুআ বর্ণিত রয়েছে। উক্ত দুআসমূহ মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে নিম্নে প্রদত্ত হল।

শত্রুর ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার দুআ

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، وَبِأَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ.

“আমি সকল শ্রেষ্ঠত্বের অধিপতি আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার উসীলায় আশ্রয় কামনা করছি যাঁর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই; আমি আরো আশ্রয় কামনা করি পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের উসীলায় যা থেকে কোন নেককার বা বদকার পরিত্রান পেতে পারে না; আমি আশ্রয় চাই

আল্লাহ তাআলার জানা ও অজানা সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে- সকল (শক্তির) অনিষ্ট ও অমঙ্গল থেকে যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন।"

জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুজাহিদদের জামাআতের সাথে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন, আমরা যেন নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করি। অতঃপর আমরা উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকি। ফলে আমরা শত্রুর হাত থেকে নিরাপদে থাকি এবং বহু মালে গনীমত আমাদের হস্তগত হয়। আয়াতগুলো নিম্নরূপ ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ. فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ، فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ، اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ. وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

"তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। বলুন, হে আমার পালনকর্তা! ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।" –সূরা মুমিনূন ঃ ১১৫-১১৮

যুদ্ধের ময়দানে পা রাখার দুআ

আল্লাহ তাআলার রাস্তা–জিহাদের ময়দানে যখন কোন মুজাহিদ পদার্পণ করবে তখন একান্ত খুশূ-খুযূ ও একাগ্রচিত্তে দুআ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ! سَرِيْعَ الْحِسَابِ! اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

"হে আল্লাহ! (হে) কুরআন কারীম অবতীর্ণকারী! (হে) দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী! হে আল্লাহ! (শত্রুর) বাহিনীকে পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করুন।"

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

"হে আল্লাহ! আমরা শত্রুর মোকাবেলায় তোমাকে সামনে রাখছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি।"

কুনূতে নাযেলা

সহীহ হাদীসসমূহে রয়েছে যে, মুসলমানরা যখন কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের হেফাযত এবং শত্রুর মোকাবেলায় মুসলমানদের কামিয়াবির জন্য নামাযের মধ্যে দুআয়ে কুনূত পড়তেন; যাকে কুনূতে নাযেলা বলা হয়।

'শরহে মুনিয়া'তে রয়েছে যে, এখনও এই কুনূতে নাযেলা পড়া সুন্নাত। 'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে রয়েছে, সর্বপ্রকার মুসীবত এবং জিহাদের জন্য কুনূতে নাযেলা এখনও মুস্তাহাব।

আজ সারা বিশ্বে মুসলমানরা নির্যাতিত-নিপিড়ীত। বিশেষতঃ পাকিস্তান সীমান্তে ইসলাম ও মুসলামানদের শত্রুরা যুদ্ধরত। তাই ইসলাম ও পাকিস্তানের হেফাযতের জন্য কুনূতে নাযেলা পড়া উচিত। ফজরের ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকাআতে রুকূর পর ইমাম সাহেব উচুঁ আওয়াজে এই দুআ পড়বেন এবং মুক্তাদীরা আমীন বলতে থাকবে। এই দুআ পড়ার জন্য কোন তাকবীর বলতে হবে না এবং হাতও উঠাতে হবে না। দুআ শেষে তাকবীর বলে ইমাম সাহেবের সাথে সিজদায় যাবে। কুনূতে নাযেলা নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ. وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَ. وقنا شَرَّ مَا قَضَيْتَ. فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ. إِنَّهُ لَا

يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. وَلاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ. تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ. وَأَصْلِحْهُمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ. وَاجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ. وَثَبِّتْهُمْ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِكَ. وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوْا نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. وَأَنْ يُّوْفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِيْ عَاهَدْتَّهُمْ عَلَيْهِ. وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ. إِلٰهَ الْحَقِّ سُبْحَانَكَ، لَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ. اَللّٰهُمَّ[১] انْصُرْ عَسَاكِرَ بَاكِسْتَانَ وَالْعَنْ كَفَرَةَ الْهِنْدِ وَالشُّيُوْعِيِّيْنَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَائَكَ. اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ. وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ، وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَلْقِ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لاَ تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

تمت بالخير

---

১. মুফতী শফী (রহঃ) এর পরবর্তী শব্দগুলো ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধের প্রেক্ষিতে লিখেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিম্নোক্ত শব্দাবলী সংযোজন করা যেতে পারে ঃ

اَللّٰهُمَّ انْصُرْ عَسَاكِرَ أَفْغَانِسْتَانَ، وَكَشْمِيْرَ، وَالْعِرَاقِ، وَالْعَنْ كَفَرَةَ أَمْرِيْكَا، وَبَرِيْطَانِيَا وَأَعْوَانَهُمَا الَّذِيْنَ

এর পরবর্তী শব্দাবলী উল্লেখিত দুআর মোতাবেক পড়তে হবে।

জিহাদ

(ফাযায়েল, মাসায়েল ও দুআ)

মূল ঃ মুফতী শফী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ

প্রকাশক

এম এম এস হুসাইনী

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০২ ইং

প্রকাশনা

মাক্‌তাবাতুল জিহাদ

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল জিহাদ